কালের ভেরী

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

বিবেকানন্দ

মহাকালের বক্ষে মহাশক্তির তাণ্ডবনৃত্য; সেই শক্তির গলায় নরমুণ্ডের মালা, হাতে রুধিরাক্ত উলঙ্গ খড়্গ; মৃত্যু তাঁহার অনুচর, ধ্বংস তাঁহার সাথী। তাঁহার নিঃশ্বাসে ভূমিকম্প হয়—ধরিত্রী টলমল করে;

নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ শ্মশানে তাঁহার বাস; সেখানে ফুল ফোটে না—পাখী গাহে না—অন্ধকারে শিবাদল চীৎকার করে—ডাকিনীর দল লোলজিহ্বা মেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। হিন্দুর মন তাহার আরাধ্যা দেবীকে এমন ভীষণ রূপ দিল কেন? যে হিন্দুর কল্পনা তাহার দেবতাকে বাঁশী হাতে নীপশাখে দোল মঞ্চে দোলাইয়াছে—সেই কল্পনাই আবার দেবতাকে অসি হাতে শ্মশানের বুকে নাচাইল কেন? যে দেবতা বৃন্দাবনের কুঞ্জে আনন্দ বিলাইয়াছে, সেই দেবতাই পাগলিনীর বেশে রণক্ষেত্রে মৃত্যু বিলাইল কেন? যে মন কৃষ্ণের কল্পনা করিয়াছে সেই মনই আবার কালীর কল্পনা করিল কেন?

কেন? কারণ হিন্দুর মন কোনও কিছুকে বিভিন্ন করিয়া দেখে নাই; ঋষির দৃষ্টিতে হিন্দু দেখিয়াছিল, এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ের দ্বারা অনন্ত ভুবন পরিব্যাপ্ত; চন্দ্র-সূর্য্যে, ওষধি-বনস্পতিতে বিরাজ করিতেছে শুধু এক; নিখিল বিশ্বের অনুপরমাণু পর্য্যন্ত সেই একের সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। জীবনের মধ্যেও যিনি মৃত্যুর মধ্যেও তিনিই; যমুনা পুলিনে যাঁহার বাঁশী বাজে, বজ্রেও তাঁহারই বাঁশী ধ্বনিত হয়। এত বড় দৃষ্টি, এত বিশাল কল্পনা হিন্দুর ছিল বলিয়াই সে ভীষণকেও নমস্কার করিয়াছে; ধ্বংসের মধ্যে মঙ্গলকে দেখিয়াছে; "মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ"—সেই প্রাণের বন্দনাগান গাহিয়াছে। ভগবান কি কেবলই কোমল? তিনি কি কেবলই প্রেম এবং আনন্দের দেবতা? বসন্তের ফোটা ফুলের মেলাতেই কি তাঁহার প্রকাশ? যে ফুল শুকাইল—যে পাতা ঝরিয়া গেল—তাহাদের পিছনেও কি তাঁহারই মঙ্গল হস্ত নাই? জীর্ণ পাতা যদি পথ রুদ্ধ করে তবে নূতন পাতা আসিবে কোন পথে? যে সূর্য্য পূর্ব্বদিগন্তে সোণা ছড়াইয়া দেখা দিল আমরা তাহাকেই দুইবাহু তুলিয়া আনন্দে অভ্যর্থনা করিব—আর যে সূর্য্য পশ্চিমদিগন্তে ডুবিয়া

গল তাহার পানে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিব—ভগবান তুমি াই—সৃষ্টি তোমার মিথ্যা ?

হিন্দুর মন এমন করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলে নাই। সূর্য্যের অস্ত াওয়াটাই চরম সত্য নহে; সে অস্ত যায় পরদিন প্রভাতে নূতন বেশে দথা দিবে বলিয়া; সে ডুবিয়া যায় নিশার আকাশে কোটি সূর্য্যের প্রদীপ গালাইবে বলিয়া। জীবনেরও যেমন সার্থকতা আছে—মৃত্যুরও ঠিক তমনি সার্থকতা আছে; মৃত্যু আসে নূতন সৃষ্টির জন্য; ভীষণ আসে ুন্দরের বার্ত্তা লইয়া; পুরাতন মরিয়া যায় নূতনকে স্থান দিবার জন্য। এই চরম সত্য হিন্দু মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল; তাই সে বংশীধারীর াথে নৃমুণ্ডমালিনী মহাকালীর পূজা করিয়াছে; জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ৃত্যুকে দুবাহু মেলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছে।

বাঙ্গালী বড় মৃদু হইয়া পড়িয়াছে; সে বাঁশিকে চিনিয়াছে, অসিকে ূর হইতে প্রণাম করিয়াছে; দেবতার মাথায় শিখিপুচ্ছ পরাইয়া তাঁহার াসলীলা দেখিতে সে ভালবাসে; আলুলায়িত কেশে ভীষণবেশে তাঁহার রণলীলা দেখিতে সে ভয় পায়; বৃন্দাবন তাহার প্রিয়—কুরুক্ষেত্রের কথা ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠে। সে একান্ত প্রিয় করিয়া দেখিয়াছে তাহার শিশুর আধ আধ কথাকে, তাহার প্রিয়ার কোমল বাহুডোরকে, তাহার মাতার স্নেহময় কোলকে, তাহার গৃহের পাখী-ডাকা বকুল-কুঞ্জকে। কে আজ তাহাকে তীরের আরাম হইতে অকূল নীরে ডাকিয়া ইয়া যাইবে ?

বাঙ্গালী আজ মহাকালীর পূজা করিতে শিখুক; সে ভীষণের উপাসক হউক। সুবোধ ছেলে দেশে অনেক হইয়াছে; তাহারা কাগজ কলম লইয়া ওকালতি করুক—স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে বাস করুক; ব্যাঙ্কে তাহাদের অর্থ দিন দিন পুঞ্জীভুত হইতে থাকুক; তাহাদের আর

প্রয়োজন নাই ; প্রয়োজন এখন সড়কির মত সোজা, লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাজা পাগলী মায়ের কতকগুলি পাগলা ছেলের দল—যাঁহারা টাকা চায় না, যশ চায় না, বিশ্রাম চায় না—চায় শুধু উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলিয়া মরিবার তীব্র সুখ ; বাঁচিয়াছি অনেকদিন, মরিতে শিখাইবে আজ কে ? তারই জন্যই ত' চাই শ্যামা মায়ের আশীর্বাদ।

জন্মাষ্টমী

দুঃখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামি,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে প্রভু
চরণ ধরি মরিব হে।

রবীন্দ্রনাথ

ভাদ্র মাস। বাদল মেঘে গুরুগুরু মাদল বাজিতেছে। অন্ধকার এমন নিবিড় যেন হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দেওয়া যায়; অবিরত ধারা-বর্ষণে উচ্ছ্বসিত যমুনা তরঙ্গ-মালায় ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে; আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—বজ্র কড়্ কড়্ করিয়া ডাকিতেছে —পৃথিবীতে বুঝি প্রলয়ের রাত ঘনাইয়া আসিয়াছে। এমনই ঘন-

কালের ভেরী

তিমিরাবৃত নিশীথে মথুরায় কংসের কারাগারে তুমি [illegible] সেদিন বলদর্পিত কংসের ভয়ে বিশ্ববাসী আর্ত্তনাদ করিতেছিল—দিকে দিকে অত্যাচারের রাজত্ব চলিতেছিল—ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছিল—উৎপীড়িত নরনারীর ডাকে তাই তুমি সেদিন আসিলে। তোমার সেদিনের আবির্ভাবকে স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষ বৎসরে বৎসরে উৎসব করিয়া আসিতেছে—তোমার জন্মোৎসব আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর বহু যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। আজও ভারতবর্ষ তেমনি করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। চারিদিক দিয়া আজ সে শৃঙ্খলিতা—তাহার মাথার উপরে বিদেশীর আইনের খড়্গ নিশিদিন দুলিতেছে—তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ কারাগারে আজ বন্দী; ক্ষুধায় সে পীড়িত—বস্ত্রাভাবে সে নগ্ন—শিক্ষার অভাবে সে মূর্খ—অবিরত শোষণে সে রক্তহীন। চিত্তে তাহার আশা নাই—কণ্ঠে তাহার ভাষা নাই—বিশ্বের পথপার্শ্বে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া সে ম্লানমুখে অবনত-শিরে দাঁড়াইয়া আছে।

মানুষের ক্রন্দনে অধীর হইয়া একদিন তুমি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মাটির কোলে অবতীর্ণ হইয়াছিলে—কারাকক্ষের অন্ধকারে জন্ম লইতে তুমি কুণ্ঠিত হও নাই! আজ কোটী কোটী নরনারীর এই নিদারুণ দুঃখ ও অপমানের দিনে তুমি যে দূরে রহিয়াছ একথা আমরা স্বপনেও ভাবিতে পারি না। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান তুমি কোন দিনই সহ্য কর নাই—যুগে যুগে সাধুর পরিত্রাণ এবং দুর্বৃত্তগণের দমনের জন্য মানুষের মধ্যে তুমি জন্ম লইয়াছ। অবিশ্বাসী বিশ্বাস করিবে না কিন্তু আমরা জানি—তুমি আসিয়াছ—কারাগারে তুমি আসিয়াছ। আমরা বাহিরে তোমায় দেবালয়ে দেবালয়ে তীর্থে তীর্থে বৃথাই অন্বেষণ

কারিতে [illegible] কংসের অত্যাচারের দিনে তুমি রাজপ্রাসাদে আবির্ভূত হও নাই—আবির্ভূত হইয়াছিলে বন্দীশালায়। চারিদিকে শৃঙ্খলের ব্যথায় যখন সকলেই জর্জ্জর, তখন সকলের প্রিয়তম হইয়া কেমন করিয়া তুমি সুখের মধ্যে জন্ম লইতে পারিতে? তাই এত স্থান থাকিতে প্রহরী-বেষ্টিত কারাগারকে তুমি বরণ করিয়া লইলে।

আজও তুমি সব-হারাদের অশ্রুজলের মাঝে বন্ধনের বুকে আসিয়াছ। ধর্ম্মধ্বজী ভীরুর দল তাহা স্বীকার করিবে না। যমুনার তীরে কদম্বের মূলে বাঁশী-হাতে যেখানে তুমি লীলা করিয়াছ সেখানে তোমার উপাসনা অতি সহজ; সেখানে ব্যথা নাই—বিপদ নাই—কঠিনের সাধনা নাই। সেই সুখের উপাসনায় তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা সুখের তাহা ত সব সময়ে সত্য নয়। তুমি আজ কারাগারে 'দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে' দাঁড়াইয়া হাসিতেছ। সেইখানে যাইয়া আমরা তোমার উপাসনা করিব—যেখানে ব্যথা সেখানে তোমাকে নিবিড় করিয়া ধরিব—সহজের ফাঁকিতে নিজেকে ভুলাইব না—দেশকে ভুলাইব না। জন্মাষ্টমীর উৎসব তোমার সেই ভীষণ রাতের জন্মোৎসব। সে উৎসব 'মন্দ-মধুর সুখের শোভায়' নহে—সে উৎসব শৃঙ্খলের ব্যথায়, কারার অন্ধকারে, ফাঁসির মঞ্চে। জাতি হিসাবে তোমাকে লইয়া উৎসব করিবার যোগ্য এখনও আমরা হই নাই। তুমি কারাগারে—আমরা বাহিরে। দুয়ের মাঝে ব্যবধান। এই ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে সেই দিন যেদিন দলে দলে কারাগারে আমরা প্রবেশ করিব—দু এক জন করিয়া নয়—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। তোমাকে লইয়া সেই উৎসব করিবার সুযোগ ও প্রেরণা আমাদিগকে দাও। তবেই কারাগার বৃন্দাবন হইয়া উঠিবে।

নমামি ত্বাং

We must always fight. God is a fighter, even He Himself. God is a conqueror. He is a devouring lion. Nothingness hems Him in and He hurls it down. And the rhythm of the fight is the supreme harmony.

Romain Rolland

এক হাতে তোমার খড়্গ; আর হাতে তোমার সর্প; ক্রুদ্ধ কেশরী তোমার বাহন; আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে তোমার বিদ্যুতের জ্বালা; পদতলে তোমার অসুর বিমর্দ্দিত; বর্ষাফলকে তাহার হৃৎপিণ্ড বিঁধিয়া প্রচণ্ড-মনোহর বেশে আজ দেখা দিলে কে তুমি মা? বজ্রের কড়্ কড়্ রবে, ঝটিকার তুমুল গর্জ্জনে কি তোমারই অট্টহাস্য আমরা শুনি নাই? অমা-নিশার অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ কি তোমারই প্রলয়ঙ্কররূপকে প্রকাশিত করে নাই? সর্পের বিষে, ব্যাঘ্রের দন্তে, মহামারীর নৃত্যে, অগ্নির লেলিহান জিহ্বায়, মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে, শ্মশানের ভীষণতার মধ্যে কি তোমাকেই আমরা দেখি নাই? ফরাসী-বিদ্রোহের

নমামি ত্বাং

নর[illegible] রক্তাক্ত গিলোটিনের পিছনে দাঁড়াইয়া তুমিই কি হাস নাই ? তোমাকে আমরা চিনিয়াছি ; তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

তুমি রুদ্রাণী ; তুমি শক্তি ; তুমি তেজ ; তুমি ভীষণ ; তুমি মধুর ; সূর্য্যের পিছনে তুমি দীপ্তি ; ফুলের ভিতরে তুমি গন্ধ ; বীরের বাহুতে তুমি বল ; জ্ঞানীর হৃদয়ে তুমি আলো ; কবির অন্তরে তুমি প্রেরণা ; তুমি এই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ; তুমি গড়িতেছ ; তুমি ভাঙ্গিতেছ ; অনন্ত আকাশে অগণিত সূর্য্যতারার নৃত্যের ছন্দে তোমারই আনন্দের প্রকাশ, তোমাকে আমরা চিনিয়াছি। তোমাকে প্রণাম।

তোমার কাছে আমরা আজ কি প্রার্থনা করিব ? সম্পদ ? সে ত' লক্ষ্মীরূপে তোমার এক পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে। তুমি যে রাজরাজেশ্বরী ; ভাণ্ডার যে তোমার অফুরন্ত। বিদ্যা ? সেও ত' সরস্বতীরূপে তোমারই আর এক পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে ; তুমি যে বাণীবিদ্যাদায়িনী মা ; সকল বেদবেদান্তের মূলে যে তোমারই আলো। রূপ ? সে ত' কার্ত্তিকেয়-রূপে তোমারই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ তোমারই সন্তান। কিন্তু সম্পদ, বিদ্যা, রূপ, সিদ্ধি এসবও পচিয়া ব্যর্থ হইবে, যদি সঙ্গে সঙ্গে তোমার খড়্গকেও স্বীকার না করি।

আজ বুঝিতে পারিতেছি, কেন তোমার এক হাতে খড়্গ আর হাতে হার, কেন তুমি এক দিকে ভীষণ, আর একদিকে মধুর। খড়্গকে যদি স্বীকার না করি, মৃত্যুকে দেখিয়া যদি পিছাইয়া যাই, অশান্তিকে যদি দূরে দূরে ঠেকাইয়া রাখি তবে ত' তোমার হারকে গলায় পরিবার সৌভাগ্য কোন দিনই হইবে না ; কুসুমের কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া পচিয়া পচিয়া মরিতে হইবে।

এবার তোমার সংহারিণী রূপকে তাই প্রত্যক্ষ করিতে চাই। বেদনা-রূপে তুমি না আসিলে চেতনা আমাদের জাগিবে না। ঘুমের পুরীতে

বদ্ধ হইয়া আছি ; ঝড়ের বেগে আসিয়া সুপ্তপুরীর প্রাকার-সব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দাও। ঘরে ঘরে অর্গল খসিয়া পড়ুক ; প্রাণের আনন্দে ছুটিয়া একবার বাহির হইয়া পড়ি।

তোমার ডাক সংগ্রামের ডাক ; বিদ্রোহকে তুমি স্তন্য দিয়া পুষ্ট করিতেছ ; তুমি ছিন্নমস্তা ভৈরবী, আপনার পিপাসা মিটাইবার জন্য সন্তানের রক্ত মাগিতেছ। তোমার ডাকে যে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, তাহার ভাগ্যে অনাহার, দারিদ্র্য ; ক্রুদ্ধ শত্রুর ভ্রূকুটী পদে পদে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে ; আপনার প্রিয়জন তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে ; ধন সে সঞ্চিত করিবে না ; যাহা সে উপার্জ্জন করিবে তাহা সে অকাতরে দুইহাতে বিলাইয়া দিবে। ললাটে তাহার বিশ্রাম লেখা নাই ; পথিক বধু তাহাকে পাগল করিয়া পথে বাহির করিয়াছে, সুদূর তাহাকে ডাক দিয়াছে। প্রিয়জন তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে—সে ক্ষণকাল বসিয়া বিদায়চুম্বন আঁকিয়া দিয়া আবার চলিতে থাকিবে। সম্মুখে তাহার অদৃশ্যহস্তের ইঙ্গিত—পিছনে তাহার ভীরুদের বিদ্রূপের হাস্যধ্বনি।

পাগলিনী মা আমার—শঙ্খ বাজাইয়া দুর্গম ক্ষুরধার পথে আজ ডাক দাও। টেবিলের উপরে কাগজ কলম যেমন পড়িয়া আছে পড়িয়া থাকুক ; আলমারি হইতে গ্রন্থ বাহির করিবার আর প্রয়োজন নাই ; কারখানায় যন্ত্রপাতি যেমন আছে তেমনি থাক। গাছের মত মাটী আঁকড়াইয়া স্থাণুবৎ অনেক দিন পড়িয়া আছি। ভোজন, ক্রীড়া ও প্রমোদে অনেক দিন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছি ; পুঁথির জগতে অনেক দিন মৃতের মত বাস করিয়াছি। এবার তোমার শঙ্খের গর্জ্জনে আরামের শয্যাতল শূন্য হউক ; মৃত্যু আসিয়া অমৃতের দ্বার খুলিয়া দিউক।

প্রার্থনা

Make your surrender true and complete, then only will all else be done for you.

Aurobindo

মা গো, তোমার আরতির দীপ-শিখা বারে বারে জ্বালাইতে গিয়াছি; বারে বারে নিভিয়া গিয়াছে; মন্দিরের অন্ধকারে পাষাণে মুখ গুঁজিয়া তাই কাঁদিতেছি; আলোর আলো, সকল দিক আলোময় করিয়া জননীর রূপে এস। তোমাকে দেখিয়া হৃদয়ের গ্রন্থি সব খুলিয়া যাক, সংশয়ের জাল ছিন্ন হউক; আঁখির তিমির-আবরণ খসিয়া পড়ুক; আমাকে তোমার অভয়-চরণের অমৃতের পরশ দাও।

তুমি চিন্ময়ী, তুমি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানরূপে বিরাজ করিতেছ। অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়া আছি; তাই এত যাতনা ভোগ করিতেছি, যাহা দুদিনের তাহাকে চিরকালের ভাবিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, যাহা চিরকালের তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছি

না। মা গো, দিব্যদৃষ্টি দাও, যাহাকে পাইলে মানুষ আর কিছুই চায় না—যাহাকে জানিলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে, বিগত-শোক হয়—তাহার লোভে অন্তরকে পাগল কর।

জননি! একমাত্র তুমিই সত্য, আর সব মিথ্যা। আমার ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া একমাত্র তুমিই আছ; আর যাহা কিছু সব আকাশের গায়ে মেঘের মত আসে, মেঘের মত মিলাইয়া যায়। আমি যেদিন বিশ্বের হাটে পদার্পণ করি নাই সে দিন তোমার কোলেই ছিলাম; আবার যে দিন এ হাট ছাড়িয়া চলিয়া যাইব সে দিন মৃত্যুরূপে আসিয়া তুমিই আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইবে। শৈশব চলিয়া যায়, কৈশোর চলিয়া যায়, যৌবন চলিয়া যায়, দেহও একদিন মাটিতে মিশিয়া যায় কিন্তু মানুষের অন্তর-গুহায় শাশ্বত আত্মারূপে তুমি চিরকাল জাগিয়া থাক; জরামৃত্যু-ব্যাধি তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আমার সঙ্কীর্ণ, মরণশীল আমিত্বকে অতিক্রম করিয়া ক্ষয়হীন যে আমার বিপুল সত্তা বিরাজ করিতেছে সে আমার ভিতরে তোমারই রূপ; সেই রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দাও; নতুবা মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিবার আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

জননি! তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি আনন্দময়ী, তুমি অন্নপূর্ণা; হেমন্তের ধানে-ভরা আঙিনায় তোমারই ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি; বসন্তের ফুলে-ভরা মালঞ্চে তোমারই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ; শরতের সোণার আলোকে তোমারই অঙ্গের লাবণ্য ক্ষরিয়া পড়িতেছে। ক্ষুধায় আমরা কাতর, দারিদ্র্যে আমরা পঙ্গু, নৈরাশ্যে আমরা অবসন্ন, রোগে আমরা মৃতপ্রায়, শোষণে আমরা নির্জীব, অত্যাচারে আমরা বিকল। আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য দাও, বীর্য্য দাও, প্রাণ দাও, পরমায়ু দাও, আশা দাও, আনন্দ দাও, মনুষ্যত্ব দাও।

জননি গো ! নিজের সঙ্গে যুঝিয়া যুঝিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যতবার উঠিতে গিয়াছি অসুরের হস্তে ততবার পরাজিত হইয়াছি। মন ক্লান্ত, উৎসাহ ক্ষীণ, উদ্যম আজ শিথিল। অসুর-মর্দ্দিনী মা আমার, এবার তোমার হস্তে আপনাকে তাই সমর্পন করিলাম ; তুমি আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা কর, আমি আমার ভার আর বহিতে পারিতেছি না। এই পঙ্ককুণ্ড হইতে তুমি আমাকে তুলিয়া লও, বজ্রের আলোতে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি করিয়া রাখিয়া দাও। তাহার পর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হউক। নিজেকে অত্যন্ত বাঁচাইতে গিয়া অত্যন্ত হানিয়াছি। আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ করিতে গিয়া অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছি। তাই তোমার চরণে আজ মরিতে চাই ; নির্ম্মম খড়্গাঘাতে আমার ক্ষুদ্র অহমিকাকে মারিয়া ফেল ; তবেই তোমার মধ্যে একদিন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায় বাঁচিয়া উঠিব। মাগো কৃপা কর।

দোল

"এই যে খেলা খেলছ কত ছলে

এই খেলা ত' আমি ভালবাসি।

এক দিকেতে ভাসাও আঁখি জলে,

আর এক দিকে জাগিয়ে তোল হাসি।"

রবীন্দ্রনাথ

আজ দোল। যিনি জন্মমৃত্যুর দোদুল দোলায় এই বিশ্ব-সংসারকে দোলাইতেছেন আজ তাঁহাকে ঘিরিয়া আমরা উৎসব করিব। যিনি একদিকে হাসাইতেছেন, আর একদিকে কাঁদাইতেছেন, একদিকে গড়িতেছেন, আর একদিকে ভাঙিতেছেন তাঁহার সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়াইব। এতদিন দুঃখের আঘাতে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছি, সুখের স্পর্শে উল্লাসে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিয়াছি; শুভ যখন আসিয়াছে তখন আনন্দের আতিশয্যে তোমার জয়গান গাহিয়াছি, অশুভ যখন আসিয়াছে তখন তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাইয়াছি, তোমাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। আজ দেখিতেছি, জীবনের যত কিছু

ভাঙ্গা গড়া সব তোমাকেই ঘিরিয়া। তুমিই আমাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া দুঃখ সুখের জোয়ার ভাটায় কেবলই দোলাইতেছ; মরণ-মাঝে একবার আমাকে লুকাইয়া রাখিতেছ—আবার জীবনের ভরা-হাটে টানিয়া আনিতেছ। এমন করিয়া আমাকে বাহু দোলায় দোলাইয়া তোমার কি লাভ, কি আনন্দ বুঝিতে পারি না। আমাকে না হইলে কি তোমার বিশ্বলীলা অসম্পূর্ণ থাকিত? আমি না হইলে কি তোমার চন্দ্র সূর্য্য এমন করিয়া আলোর জোয়ারে ভুবন প্লাবিত করিত না? বসন্তের মাধবী-মঞ্জরীতে কুঞ্জবন কি এমন করিয়া ভরিয়া উঠিত না?

জানিনা। শুধু জানি, আমাকে না হইলে তোমার আনন্দের মধ্যে কোথাও যেন ফাঁক থাকিয়া যাইত; বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে ঋতুতে ঋতুতে তোমার উৎসব এমন করিয়া জমিয়া উঠিত না। আমার জন্য তুমি অনাদিকাল হইতে দুরু দুরু কম্পিত-বুকে প্রতীক্ষা করিতেছিলে। আমি আসিলাম; তোমার আনন্দ, তোমার উৎসব সম্পূর্ণতা লাভ করিল। তোমার সেই খুসী আজ বসন্তের ফুলের মেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চাঁদের কিরণ-সুধায় ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রভাতের অরুণ-আভাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হে অসীম, হে অরূপ,—আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিবার জন্য, আমার শ্রবণে তোমার বিশ্বসঙ্গীত শুনিবার জন্য, আমার দেহ মন ভরিয়া তোমার অমৃত পান করিবার জন্য আমাকে তুমি চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের তলায় এই শ্যামলধরার বুকে ডাক দিয়াছ; আমাকে পরম সোহাগে তোমার বামে রাখিয়া বাঁকা-বাঁশীর সুরের জোয়ারে গগন প্লাবিত করিতেছ।

আমি ধন্য, আমি ধন্য। তোমার অনন্ত বিশ্ব-লীলায় আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়াছ; আমি ধন্য। আমি দেখিতেছি, বিশ্বসাগর

অহর্নিশি ঢেউ খেলাইয়া কেবলই দুলিতেছে,—জোয়ার-ভাটায়, আলো-ছায়ায়, হাসি-কান্নায় এই বিশ্ব কেবলই দুলিতেছে—সীমাহীন আনন্দের মধ্যে নিখিল ভুবন কেবলই দুলিতেছে। মৃত্যু ঝলকে ঝলকে প্রাণে রূপান্তরিত হইতেছে, অস্ত উদয়কে বারে বারে নূতন রঙে রঙীন করিয়া তুলিতেছে। সুন্দর! নিখিল বিশ্বের সব কিছু সুন্দর! মধুর! যাহা কিছু আমাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে সব কিছু মধুর! সৃষ্টি মধুর, ধ্বংস মধুর, জীবন মধুর, মৃত্যু মধুর, আলো মধুর, আঁধার মধুর, হাসি মধুর, কান্না মধুর এই চির মধুর বৃন্দাবনে সারানিশি সারাবেলা তোমার সঙ্গে আমার প্রেমের খেলা চলিতেছে; এই আনন্দের যমুনাতীরে অনন্ত কাল ধরিয়া দুলিতেছি—আমি আর তুমি, তুমি আর আমি।

ঝুলন

"I will sing the God of the two mighty wings. Hosanna to life! Hosanna to death!"

Romain Rolland

ঝুলনের উৎসব আসিল। ভাগবতকার সুললিত ছন্দে এই উৎসবের যে চিত্র আঁকিয়াছেন বহু শতাব্দীর পরেও তাহা পুরাতন হইল না। কলনাদিনী যমুনা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। নির্মেঘ আকাশে পূর্ণ শশধর হাসিতেছে; যমুনার জলকণা বহন করিয়া বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে; তীরে তমালবনের পাতায় পাতায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে; বাতাস আসিয়া সোহাগভরে শাখাগুলিকে দোলাইতেছে। জলে স্থলে আকাশে আজ একি সমারোহ! দিকে দিকে মধু যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছে! প্রিয়জনের সহিত মিলনের জন্যই বুঝি বিধাতা এমন সুন্দর ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সহসা আকাশে বাতাসে সুরের তরঙ্গ তুলিয়া বনের বুকে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পাগল-করা সেই বাঁশীর মূর্চ্ছনা। যাহার যত কাজ

দশহরা

"এই তিথিতে জাহ্নবী দশবিধ পাপ, দশজন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করেন বলিয়া এই তিথির নাম দশহরা হইয়াছে।"—বিশ্বকোষ

কোনও বিশেষ তিথিতে কোনও বিশেষ নদীর জলে স্নান করিলে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপরাশি ধুইয়া যায় কি না তাহা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আমরা হৃদয় হইতে অনেক উচ্চ ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। ধর্ম্মকে আমরা একটা কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অজ্ঞানতা বলিয়া উপহাস করিতে দ্বিধা বোধ করি না, প্রকৃতির প্রতি মানবহৃদয়ের চিরন্তন অনুরাগ আমরা হারাইয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রের কতকগুলি অর্থহীন আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গিয়া আমরা একটা শূন্যতার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছি। ফেরঙ্গ শিক্ষা ও ফেরঙ্গ সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল ফলিয়াছে এইখানে।

জানি না গঙ্গাপূজার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল কবে—কে যে প্রথম যুক্তকরে জাহ্নবীর অর্চ্চনা করিয়াছিল তাহাও জানা নাই। কিন্তু

শান্তসলিলা সুরধুনীকে প্রথম যিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত না হইলেও কুসংস্কারাপন্ন যে ছিলেন না তাহা জোর করিয়া আমরা বলিতে পারি। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হইয়া ভাগীরথীর শীতল জলে যিনি একবার ঝাঁপ দিয়াছেন তিনিই জানেন গঙ্গার বুক কত স্নিগ্ধ, কত মধুর—জগতে একমাত্র মাতৃকোলের সঙ্গেই তাহার তুলনা হয়।

গঙ্গা! ভারতের কত শত বৎসরের ইতিহাস এই পবিত্র নামের সহিত জড়াইয়া আছে। ইহার তীরে তীরে কত তীর্থস্থান জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কত কালের বিচিত্র সুর ধ্বনিত হইতেছে। কত শত মন্দিরের কোটী প্রভাত-সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ইহার জলের সঙ্গে মিশাইয়া আছে; কতকালের কুমারী ও পুরনারীর দল ইহার তরঙ্গে ফুলফল ও ঘৃত-প্রদীপ ভাসাইয়াছে। গঙ্গার বীচিমালার তালে তালে আজও সহস্র বৎসরের ভারতের হৃদয়-পদ্ম দুলিতেছে।

গঙ্গা—হিমালয়ের মত, বেদ উপনিষদ গীতার মত কত কালের পবিত্র এ নাম! রঘুকুলমণি রামচন্দ্র যখন বনে গিয়াছিলেন তখন জনকনন্দিনী সীতাদেবী গঙ্গা নদী পার হইবার সময়ে একদিন করজোড়ে জাহ্নবীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেদিন জনকদুহিতার দু এক ফোঁটা অশ্রুজল গঙ্গার বক্ষে মিশিয়াছিল কি না কে জানে। তারপর আর একদিন দরবিগলিত অশ্রুধারায় গঙ্গার সৈকতভূমি সিক্ত করিয়া প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমে নাচিয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে শৈশবের কত দিন বালসুলভ চপলতায় তাঁহার কাটিয়াছে, কত জ্যোৎস্নাগর্ব্বিত-যামিনী শিষ্যগণসঙ্গে তিনি গঙ্গাতীরে কাব্যালোচনায় কাটাইয়াছেন। আবার এই গঙ্গার তীরেই বাঙ্গালীর প্রাণের নিমাই সহস্র নরনারীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া একদিন চাঁচর কেশ মুড়াইয়াছিলেন। সেদিনও

এই গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী বনে যুগাবতার পরমহংসদেব জগন্মাতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সেই ভক্তকণ্ঠের কাতর 'মা' 'মা' ধ্বনি বাঙ্গালী কখন ভুলিতে পারে? গঙ্গার সঙ্গে বাঙ্গালীর তাই অনেক-কালের অশ্রুহাসি মিশাইয়া আছে। বাঙ্গলা দেশে আজ সেই গঙ্গাপূজা; শতসহস্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে আজ গঙ্গামায়ের জয়ধ্বনি। এস, বাঙ্গালী! ভক্তিভরে আজ জননী জাহ্নবীকে প্রণাম করি।

বড়দিন

Moaning pacifism is the death-knell of peace ; it is cowardice and lack of faith.

Romain Rolland.

জীবন আসে মৃত্যুর মধ্য দিয়া—তুঃসহ বেদনার মাঝে মাতা সন্তানকে সৃষ্টি করে। বড়দিন মানবের মহোৎসবের দিন—কারণ ঐদিন এমন এক মানব-শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি উত্তরকালে পরম বেদনার মাঝে পৃথিবীতে নবজীবনের পত্তন করিয়াছিলেন—রক্তাক্ত ক্রুশকাষ্ঠে প্রেমের অমর পারিজাত ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রোমসাম্রাজ্যের কবলে পড়িয়া ইহুদী জাতির সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম। বৃটিশসাম্রাজ্যের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া আমাদের আজ যে দশা হইয়াছে—ইহুদীদেরও ঠিক সেই দশাই উপস্থিত হইয়াছিল। পরপদানত ইহুদী জাতির অস্ত্র ছিল না, সম্পদ ছিল না, সাহস ছিল না, স্বাধীনতা ছিল না। নির্ব্বীর্য্য ভীরুজাতির সম্বলের মধ্যে ছিল শুধু সামাজিক কুসংস্কারের বোঝা আর বিদেশী শাসকদের অত্যাচার।

নিরুপায় জাতি ভগ্নহৃদয়ে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া অতিকষ্টে চলিতেছিল। সহস্র সহস্র ইহুদী নরনারী সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল এমন একজনকে যিনি তাহাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্তির মধ্যে লইয়া যাইবেন। নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত জাতির বেদনার সাগর মন্থন করিয়া রূপ লইলেন খৃষ্ট। এই কপর্দ্দকহীন অতিমানব ধূলিধূসরিত পায়ে যীহুদার পল্লীতে পল্লীতে এক নূতন বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই বাণী হইতেছে একের মন্ত্র, সাম্যের মন্ত্র। তিনি সকলকে ডাক দিয়া বলিলেন—ভগবান এক ; তাঁহার কাছে সকল জাতি, সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। ধনের স্পর্দ্ধাকে, ক্ষুদ্র স্বাজাত্যাভিমানকে তিনি ক্ষমা করিলেন না। তিনি বলিলেন—যাহারা ধনবান, অপরকে বঞ্চিত করিয়া যাহারা আপনাদিগকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে—ঈশ্বরের রাজ্যে তাহাদের প্রবেশের কোন অধিকার নাই। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." মানুষের চিন্তা-জগতে তিনি বিপ্লবের বিপুল ঝটিকা আনিয়া দিলেন। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জগতকে এক নূতন ভিত্তির উপর তিনি দাঁড় করাইতে চাহিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারিল না—কিন্তু উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় তাঁহার বাণী শুনিয়া ত্রাসে থর থর কাঁপিয়া উঠিল—নবসত্যের তীব্র আলোকচ্ছটা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা দেখিল—দরিদ্র সূত্রধরের পুত্রের মুখ দিয়া যে সাম্যবাদের বাণী প্রচারিত হইতেছে সেই সাম্যবাদের শুভ্র জ্যোতির রাজ্যে বাহুবল, ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান নাই—সেখানকার রাজত্ব শুধু প্রেমের রাজত্ব। সত্যের কণ্ঠস্বর রক্তের

সাগরে ডুবাইয়া দিবার জন্য বিদেশী শাসকের দল তাঁহাকে ক্রুশকাষ্ঠে হত্যা করিল। অসহ্য বেদনা সহিয়া খৃষ্ট প্রাণ ত্যাগ করিলেন—কিন্তু যে মৃত্যুহীন প্রাণ তিনি দান করিয়া গেলেন তাহার বন্যায় রোম সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল—বিশ্বে নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাহার পর শত শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; সে দিনের সেই নির্ভীক সাধক আজ আর এক অতিমানুষের রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এবারেও তাঁহার লীলাক্ষেত্র এসিয়া—অস্ত্র সত্য আর অহিংসা। এই নূতন মানুষের নাম মহাত্মা গান্ধী। সে দিনের সংগ্রাম ছিল রোমসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে; আজিকার সংগ্রাম বৃটিশসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। খৃষ্টের মত মহাত্মাগান্ধীর হস্তেও শান্তির শুভ্র পতাকা। কিন্তু এই শান্তির পথ দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া নহে—শক্তির মধ্য দিয়া। এ পথ বীরের হৃদয় শোণিতে রক্তাক্ত। যেখানে শক্তি নাই, বীর্য্য নাই সেখানে শান্তি মৃত্যুর লক্ষণ। মহাত্মা গান্ধীর কাছে হিংসার পথ—অকল্যাণের পথ; কারণ হিংসা দুর্ব্বলতার পরিচয়। খৃষ্ট আপনি মরিয়া মরণের মন্ত্রে ইহুদীজাতিকে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; গান্ধীর মন্ত্রও—মরণের মন্ত্র; তিনি জাতিকে মরিতে শিখাইবার জন্য আসিয়াছেন। এই মরণ উপায়হীন ক্লীবের অনিচ্ছার মরণ নহে—সত্যাগ্রহী বীরের আত্মদানের আলোকচ্ছটায় এই মৃত্যু দেদীপ্যমান। যে জাতি মরিতে জানে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে কে? সেদিন নিঃসহায় ইহুদীবীরের পিছনে যীহুদার সহস্র সহস্র দরিদ্র নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছিল; আজও ভারতের কোটী কোটী নরনারী গান্ধীর পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। রোমের সাম্রাজ্যবাদীর দল ক্রুশকাষ্ঠে যে সত্যকে হত্যা করিতে পারে নাই—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল কারাগারে কি সেই সত্যকে চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে?

ঈদ

"The apostle of action had come to the belief that there was only one course of action that was really good—not to do evil".

John Christopher.

আজ কোরবাণীর দিন। হিংসা নয়, ঈর্ষ্যা নয়, ক্রোধ নয়—আজ বিশ্বাসের দিন, ত্যাগের দিন; ভগবানের কাছে—খোদাতালার কাছে জীবনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—আজ তাহাকে হাসিমুখে নিবেদন করিবার দিন। ইব্রাহিম খোদার আজ্ঞায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আপনার একমাত্র পুত্রকে বিধাতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়াছিলেন। ঈদ সেই মানবের শ্রেষ্ঠ বলিদানকে স্মরণ করিবার দিন।

কিন্তু ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কত না নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে! ঈশ্বরের নামে মানুষ এ পর্য্যন্ত কত না বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে! ভগবানের দোহাই দিয়া মানুষ মানুষকে ক্রুশে দিয়াছে, জবাই করিয়াছে, পোড়াইয়া মারিয়াছে, মন্দির ভাঙ্গিয়াছে, মসজিদ

জ্বালাইয়াছে ; হেন পাপ পৃথিবীতে নাই যাহা মানুষ ধর্ম্মের নামে করে নাই।

পূজাপার্ব্বণের দিন আসিলে তাই ভয়ে হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে। নাস্তিকতায় পরকালে বিপদ থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু ইহকালে নাস্তিকের দল কদাচিৎ ধরার শান্তি ভঙ্গ করিয়া থাকে। ভয় করি শুধু ধর্ম্মের গোঁড়ামীকে। কেন না ধর্ম্মান্ধতা হইতে পরকালে স্বর্গের আশা যত কিছু থাকুক না থাকুক ইহকালে খড়্গের আশঙ্কা যে যথেষ্ট আছে তাহার বিশেষ পরিচয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে আমরা বহুবার পাইয়াছি।

কিন্তু অতীতের বীভৎস ঘটনার কথা আজ স্মরণ করিয়া লাভ কি? আজ ভারতের সাত কোটী নরনারীর পবিত্র ধর্ম্মের দিনকে অতীতের পঙ্কিল স্মৃতির কালিমায় আমরা কলঙ্কিত করিব না। আমরা যাহা ভয় করি তাহাকেই ডাকিয়া আনি ; "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়" ইহা কেবল প্রবাদ বাক্য নহে, অনেকখানি সত্য ইহার পিছনে লুকাইয়া আছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে কোন দিন কোন বিরোধ ছিল না, এখনও নাই। অতীতে যাহা কিছু বিরোধ হইয়া গিয়াছে তাহা উভয় সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম্মান্ধের প্ররোচনায়। এই স্বার্থপর নরপিশাচগণকে কে বা কাহারা অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম-বিদ্বেষের বিষ ছড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের কলহ বা মিলনের উপর বিজেতার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। আমরা নিজেদের মধ্যে যত মারামারি করিব—ততই আমাদের শক্তিক্ষয় হইবে ; আমাদের যত বেশী শক্তি ক্ষয় হইবে শাসক-দলের শক্তি ততই বাড়িতে থাকিবে। শত্রুর শক্তি বাড়াইয়া নিজেদের

সর্ব্বনাশ ত' আমরা অনেক করিয়াছি। এখনও কি আমাদের চেতনা জাগে নাই?

হিন্দু ও মুসলমানকে আমরা আজ শুধু একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিব। স্বার্থপর গোঁড়াদের কথা শুনিয়া ভ্রান্তপথে যেন আমরা চালিত না হই। সত্য কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ভগবান গরুর মধ্যে আছেন অথবা মহিষের মধ্যে আছেন, মন্দির অথবা মসজিদ কোনটী তাঁহার আসলস্থান, বেদ অথবা কোরাণ কিসের মধ্যে তাঁহার বাণী লুকাইয়া আছে—এ সব প্রশ্নের মীমাংসা তর্কে নাই—কেন না ভগবান বাক্যমনের অতীত। আমরা নিজের নিজের বিশ্বাস মত এক একটী ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলি। একজনের সঙ্গে আর একজনের বিশ্বাসের মিল সব সময়ে না থাকিতে পারে কিন্তু তাহা লইয়া সব সময়ে যদি কলহ করিতে হয় তবে জগৎ কুস্তির আখড়া হইয়া উঠে। এই জন্যই যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানবগণ মৈত্রী ও ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়াছেন।

ভারতে আজ এই পরমত-সহিষ্ণুতার যত প্রয়োজন এমন আর কিছুরই নহে। মুসলমানের ধর্ম্মে যদি গো-কোরবাণীর কথা লেখা থাকে তবে লাঠির জোরে গো-বধ বন্ধ করিতে যাওয়া হিন্দুর পক্ষে শুধু অন্যায় হইবে না, মূর্খতাও হইবে। গোরাদের মাংসের জন্য ইংরাজও দেশে লক্ষ লক্ষ গরু জবাই করিতেছে; আমরা কি তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছি? পারি নাই কেন? না ইংরাজের রাইফেল আছে আর মুসলমানের আছে মাত্র লাঠি ও ছুরি। আবার মসজিদের পাশ দিয়া হিন্দু যখন সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যায় তখন মুসলমান লাঠি লইয়া ছুটে—কেন না হিন্দুর অস্ত্রের মধ্যে শুধু খোল ও করতাল; গোরার ব্যাণ্ড বাদ্য থামাইতে মুসলমান সাহস পায় না, কেন না গোরার হাতে থাকে বেয়নেট। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা দাস-জাতির স্বভাব।

কিন্তু অধিকারই সকল সময়ে বড় কথা নহে। গরু কাটিবার অধিকার আছে বলিয়াই যদি প্রকাশ্যে কোরবাণী করি তবে প্রতিবেশী হিন্দুর মনে অকারণে ব্যথা দেওয়া হয়। অন্যকে অকারণে ব্যথা দেওয়া কোন ধর্ম্মেরই অনুশাসন নহে।

আসল কথা, সাত কোটী মুসলমান যদি মনে করে গায়ের জোরে বাইশ কোটী হিন্দুর ন্যায্য অধিকার দাবাইয়া রাখিব অথবা বাইশ কোটী হিন্দু যদি মনে করে সাত কোটী মুসলমানের অধিকারকে চিরতরে ঠেকাইয়া রাখিব তবে উভয়েরই মূর্খতা চরমে উঠিয়াছে বলিতে হইবে। অনেক নিরীহ হিন্দু মুসলমান বুকের রক্ত দিয়া এই মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আর নয়। গোহত্যা পাপ হইতে পারে কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী পাপ নরহত্যা। গো-কোরবাণী পুণ্য হইতে পারে কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী পুণ্য প্রতিবেশীর চিত্তে অযথা আঘাত না দেওয়া—মানুষের সহজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে মর্য্যাদা দান করা

রাখীবন্ধন

শুভ রাখীবন্ধনের প্রভাতে শ্রদ্ধানত হৃদয়ে, বাঙ্গালী, আজ তোমার অতীতের গৌরবকে স্মরণ কর; স্মরণ কর তোমার সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, ব্রহ্মবান্ধবকে; স্মরণ কর তোমার অশ্বিনীকুমার, কাব্য-বিশারদ, আবদুল রসুলকে; স্মরণ কর তোমার তপস্যাকে, ত্যাগকে, নিষ্ঠাকে, মৈত্রীকে, ঐক্যকে, নবজীবনের প্রথম চাঞ্চল্যকে।

১৯০৫ সাল। বাঙ্গলার আকাশে আকাশে তখন অশনির হুঙ্কার, মেঘে মেঘে বিদ্যুতের ভ্রূকুটী—বাঙ্গলার বুকে তখন কাল-বৈশাখীর উদ্দাম নৃত্য। কার্জ্জন তখন ভারতের বড়লাট—আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধা লইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছিলেন। হিন্দুস্থান ছিল তাঁহার কাছে খেলার ঘর—গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে ছিল খেলার পুতুল। এমনি একটা উৎকট ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা ছিল বলিয়াই তিনি দেশের সমস্ত আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলার বুকে শেল হানিতে সাহস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্জ্জনের শাপ আমাদিগের পক্ষে বর হইয়া দাঁড়াইল, ইংরাজের দেওয়া বেদনা আমাদিগকে চেতনা দান করিল। দেশের সেই দুর্দ্দিনের ঝটিকামাঝে বজ্রাগ্নির আলোক-শিখায় বাঙ্গালী

মাকে চিনিল, ভাইকে চিনিল, আপনাকে চিনিল। লর্ড কার্জ্জন নব্য-ভারতের জন্ম দিল, তরুণ বাঙ্গলার সৃষ্টি করিল, দেশের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে এমন প্রচণ্ড আগুন জ্বালাইয়া দিল, যাহার শিখা আর নিভিতে চাহিল না।

দুঃখের মাঝে সেই যে একদিন বাঙ্গালীর ঘরের যত ভাইবোন দেশ-মাতৃকার চরণ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শরতের সোণার আলোকে নীল নির্ম্মল আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া সোণার বাঙ্গলার জয় গান গাহিয়াছিল, সেইদিনটী বাঙ্গালীর ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিল। বাঙ্গলায় সেদিন রাখী বন্ধনের দিন। ভাগীরথীর পূতসলিলে স্নান করিয়া ভাই বোনের হাতে সেদিন রাখী পরাইয়া দিল, বোন ভ...র হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল, ভাই ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গন করিল—কোটী কণ্ঠের "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে তৃণে তৃণে সেদিন পুলকের শিহরণ উঠিল।

এস বাঙ্গালী—সেদিনকে স্মরণ করিয়া আজ সব দ্বেষহিংসা ভুলিয়া যাই—কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—

"বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।"



তরুণের কথা

বিদ্রোহী যৌবন

"In every social progress, the great and the only difficult work is the destruction of the past."

Macterlinck.

পণ্ডিত জহরলাল দেশের যৌবনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে ভাবিবার অনেক কিছু আছে। যৌবনের ধর্ম্মকে তিনি চলার ধর্ম্ম বলিয়াছেন! এই চলাই হইতেছে সজীবতার চিহ্ন। আর সকলে যেখানে নির্ব্বিবাদে পুরাতনকে মানিয়া চলে—যৌবন সেখানে জীর্ণ বিধি-নিষেধের আবর্জ্জনাকে জানালার বাহিরে দূর করিয়া দেয়। যে অরণ্যে কেহ কোন দিন প্রবেশ করে নাই সেই অরণ্যে যৌবন তাহার কুঠার লইয়া প্রথম প্রবেশ করে; যে সমুদ্রে কেহ কোন দিন পাড়ি দেয় নাই সেই সমুদ্রে যৌবন প্রথম তাহার তরী ভাসাইয়া দেয়—যেখানে কোন দিন কোন পথের চিহ্ন ছিল না, চলার বেগে পায়ের তলায় সেখানে যৌবনই পথ প্রথম জাগাইয়া তুলে। এই পুরাতন হইতে নূতনের পানে যৌবনের চির-অভিসার। 'প্রবীণ পাকার

দল' নূতনকে ভয় করে—কারণ দৃষ্টি তাহাদের পিছন দিকে; নূতন-কিছুকে ধরিতে গিয়া পাছে সে ভুল করিয়া বসে—এই ভয়েই সে কম্পমান। নবীন পথ ভুলিয়া মরিতে রাজি আছে কিন্তু অচলায়তনের মধ্যে মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করিয়া সে বাঁচিতে রাজি নহে। এই ভুল করিবার সাহস তাহার আছে বলিয়াই নূতন নূতন সত্যকে আবিষ্কার করিবার ক্ষমতাও তাহার আছে। কলম্বাস নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য যেদিন সমুদ্রে প্রথম ভাসিয়াছিলেন সেদিন কূল-হারা জলরাশির বুকে পথ হারাইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল—কিন্তু পথের ভুল হইবে—এই আশঙ্কায় যাত্রা তাঁহার বন্ধ হয় নাই। এই যে, উদ্দামতা, এই যে কুছ্-পরোয়া-নেই ভাব, এইখানেই যৌবনের বিশেষত্ব।

যৌবন বে-পরোয়া বলিয়াই সে বিদ্রোহী। জীর্ণ সংস্কার তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না,—মিথ্যার সঙ্গে তাহার আপোষ চলে না। সে সত্য চায়, অমৃত চায়, মুক্তি চায়, জীবনের চাঞ্চল্য চায় কেবল নিজের জন্য নহে—বিশ্বের সকল নরনারীর জন্য। প্রবীণের দল চায় কাঞ্চন, চায় রাজ্যবিস্তার, চায় যুদ্ধ, চায় দাসত্ব, চায় পুরাতনকে মহাকালের বুকে চিরন্তন করিয়া রাখিতে। এই দুই চাওয়ার মধ্যে কোনখানে মিল নাই—তাই নবীন ও প্রবীণের আদর্শের সংঘর্ষে বিশ্বসাগর আজ ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে; ঘরে বাহিরে, রাষ্ট্রে সমাজে, সাহিত্যে ধর্ম্মে সর্ব্বত্র আজ আলোড়ন। অত্যাচারের সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে, কপটতার সঙ্গে, পুরাতনের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া যাহারা চলিতে পারে নাই বিদ্রোহী বলিয়া আজ তাহারা সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত। রাষ্ট্র তাহাদিগকে কারাগারে বন্দী করিতেছে, সমাজ তাহাদিগকে কালাপাহাড় বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে, পরিবার তাহাদিগকে লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া গালি দিতেছে, শিক্ষক তাহাদিগের স্কন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার কলঙ্ক চাপাইতেছে। এই

কলঙ্কের পশরা শিরে লইয়া কণ্টকাকীর্ণ পথে যৌবন তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে।

মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের এই যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ইহাকে অভিনন্দিত করি। যাহারা নিজের স্বাধীন চিন্তাকে চাপা দিয়া অন্যের কেবল প্রতিধ্বনি করিয়াছে—তাহাদের ক্ষীণ-স্বর কালের বক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। যাহারা দশের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া চলে নাই—দশের সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে তাহারাই যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধের যুগে ভোগবাদের যখন আধিপত্য চলিতেছিল তখন 'মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়াইয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সংসারের তলে তলে অসীম দুঃখের প্রবাহ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া তিনি দুঃখ হইতে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়াছিলেন ; আর সকলের মত ভোগের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন নাই। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে সেই একটী মানুষের একলা-হিয়ার স্বপ্ন ইতিহাসে যে রেখাপাত করিয়াছে বহু শতাব্দীর পরে তাহা আজও মলিন হইল না। গৌরাঙ্গ তাঁহার সমসাময়িক যুগের সমাজের সহিত একতালে পা ফেলিয়া চলিতে পারেন নাই। জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সকল নরনারীকে তিনি একই পতাকাতলে মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। সেদিনের ব্রাহ্মণ শাসিত নবদ্বীপ তাঁহাকে ক্ষমা করে নাই। বিদ্রোহী নিমাইকে নীলাচলে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বৈষ্ণব সভ্যতা সেই নিমাইয়ের সৃষ্টি। যিশুখৃষ্টের বাণীও বিদ্রোহের বাণী। রক্ষণশীল ইহুদী সমাজ সেই বাণীর তীব্র আলোকচ্ছটা সহ্য করিতে পারে নাই। তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বলি দিয়াছিল। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহী খৃষ্টকে ঘিরিয়া। পাছে শত্রুর ইঁট গায়ে লাগে এই আশঙ্কায় রামমোহন রায়কে কলিকাতার রাস্তায় গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে হইত—

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে এই কথা লেখা আছে। রাজার হাতে বিদ্রোহীর কুঠার দেখিয়া তখনকার সমাজ তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাত করিয়াছিল তবুও সেই রামমোহনই নব্য-বাঙ্গলার স্রষ্টা। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদকে মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সেদিনের আরব তাঁহাকে ক্ষমা করে নাই। অতীতকে তিনি ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন। এমনি করিয়া বিদ্রোহী এক একটী মানুষকে ঘিরিয়া মানুষের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যৌবনকে যদি কেহ বিদ্রোহী বলে—সে উহার কলঙ্ক নহে—সে উহার অলঙ্কার।

এই ভাঙনের পথে বাঙ্গলার যৌবন অকুণ্ঠিত-চিত্তে আগাইয়া চলুক—তাহার এক পায়ের আঘাতে জীর্ণ জরা সব ভাঙিয়া পড়িবে—আর একপায়ের পরশে পথে পথে নব নব ফুল ফুটিয়া উঠিবে। ভাঙন—কেবল ভাঙনে পর্য্যবসিত হয় না—সৃষ্টির দ্বার সে উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

স্বাধীনতার স্বপ্ন

"If the spirit of India now surges forth from temples and forests, it is because it holds the message for which the world is sighing."

Romain Rolland.

"যেদিন হইতে আমি ভারতের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আগামী কল্যকার সেই স্বাধীন ভারত অদ্যকার পরাধীন ভারতের ন্যায় ধ্রুব সত্য।" ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে এই যে অবিচলিত বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের জোরেই সুভাষচন্দ্র বরিশাল কনফারেন্সে উপরের কথাগুলি এমন দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছেন। যে লক্ষ্যের অভিমুখে আমরা অগ্রসর হইতেছি সেই লক্ষ্যে আমরা যে একদিন পৌঁছিব—এই বিশ্বাস না থাকিলে চলিবার উৎসাহ লোপ পায়, সম্মুখের দীর্ঘপথের বাধা-বিঘ্নের দিকে চাহিয়া মাথা ঘুরিয়া উঠে, হৃদয় অচিরে অবসন্ন হইয়া পড়ে—লক্ষ্য চিরদিনই দূরে পড়িয়া রহে। এই জন্যই বিশ্বাসের প্রথম

প্রয়োজন। বিশ্বাস আসিলে বীর্য্যও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থাকে—বীর্য্য আসিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। আজ যদি আমাদের স্বাধীনতালাভের পথে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু কেহ থাকে তবে তাহা ইংরাজের জেপ্‌লিন ও মেশিনগান নহে,—হিন্দু-মুসলমানের কলহ এবং অস্পৃশ্যতাও নহে,—সেই শত্রু হইতেছে আমাদের অবিশ্বাস। আমরা আজ ইংরাজের দুর্গ, ইংরাজের রণতরী, ইংরাজের সৈন্যবাহিনী এবং ইংরাজের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামকেই একান্ত বড় করিয়া দেখিতেছি।

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, মানুষের মধ্যে স্বাধীন হইবার যে আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহা দুর্দ্দমনীয়। কোন বাধা, কোন বিঘ্নই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। এই মানুষ একদিন বন্য অবস্থায়, অসহায় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেদিন বন্য পশুর সহিত লড়াই করিবার তাহার অস্ত্র ছিল বৃক্ষের শাখা ও প্রস্তরখণ্ড; সেদিন বন্য ফলমূল ছিল তাহার আহার্য্য, আশ্রয় ছিল গিরিগুহা ও তরুমূল। সে দিনের সেই অসহায় দুর্ব্বল মানুষ আজিকার এই সুসভ্য দুর্জ্জয় মানুষের স্তরে উঠিয়া আসিয়াছে। সকল বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিবার প্রেরণা মানুষকে দিয়াছে কে? স্বাধীন হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। মানুষ বলিয়াছে, আমি অতিকায় জীব জন্তুর বশ্যতা স্বীকার করিব না—তাহাদিগকে আমার পদানত করিব; আমি বন্য পশুর মত আহার্য্যের জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করিব না—আমি ইচ্ছা মত হলমুখে ধরণীর গর্ভ হইতে ফলশস্য আদায় করিব; আমি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিব না—আমি প্রবৃত্তির উপরে প্রভু হইব, আমি মানুষ হইতে দেবতার স্তরে উঠিব। তাহার সেই স্বাধীন হইবার দুর্জ্জয় বাসনা আজ সকলের উপরে জয়ী হইতে চলিয়াছে। সমুদ্র পর্ব্বত তাহার গতিকে রুধিয়া রাখিতে পারে নাই, বর্ব্বর মানুষের অসংযত প্রবৃত্তিকে সে বহুল পরিমাণে জয়

করিয়াছে—স্বেচ্ছাচারমূলক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সে গণতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছে—তাহার স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা সকলের উপর জয়ী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মানুষও মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহার মধ্যেও আদিম কালের সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত হইয়া আছে। যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাহাকে বর্ব্বরতার স্তর হইতে এতদূর লইয়া আসিয়াছে—কত যুগের কত পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করাইয়াছে—সেই আকাঙ্ক্ষা অচিরে তাহাকে বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্ত করিবে। তাহা যদি না করে তবে মানুষের সমস্ত অতীতের ইতিহাস মিথ্যা হইয়া যায়, তাহার বাঁচিবার কোন প্রয়োজন থাকে না।

তাহা ছাড়া জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না যদি আমাদের বাঁচিবার সব প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়া থাকে। যে গাছ ফল দিবার শক্তি হারাইয়াছে গৃহস্থ তাহাকে কাটিয়া ফেলে। বিধাতা অতীতের অন্যান্য বহু জাতির মত জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতেন—যদি তিনি আমাদিগের নিকট হইতে কিছু আশা না করিতেন। বিশ্বের সভ্যতা আজ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার শূন্য ভাণ্ডারকে নব নব সম্পদে পূর্ণ করিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজ রাত্রির অন্ধকারে তপস্যা করিতেছে। স্বাধীনতার সেই জ্যোতিশ্ময় প্রভাতে ভারতবর্ষ যাহা দান করিবে—আজিকার পরাধীন ভারতের গান্ধী-অরবিন্দ-রবীন্দ্র-জগদীশ তাহার সূচনা করিতেছেন মাত্র।

এই বিশ্বাস চাই; ভবিষ্যত ভারতবর্ষের এই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমাদিগকে প্রতিদিন বিনিদ্র নয়নে কাজ করিতে হইবে। আজ আমাদের 'অবিশ্বাসই' মেঘের মত সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকে আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—আমাদের বিশ্বাসের

সূর্য্যোদয়ে সেই মেঘরাশি উড়িয়া যাইবে—ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সগৌরবে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইবে। মানুষের ভিতর স্বাধীনতার যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহারই আলোকে বিশ্বাস লইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব,—শ্রমিকের দল আজ কেন সংঘবদ্ধ হইতেছে—কেন তাহারা সর্ব্বত্র আপনাদের অধিকারের জন্য ধর্ম্মঘট করিতেছে, কেন তরুণের দল, ছাত্রের দল দিকে দিকে জাগরণের কলরব তুলিয়াছে—কেন দেশের তরুণীগণও তরুণগণের সঙ্গে একতালে পা ফেলিয়া চলিবার প্রয়াস পাইতেছে—কেন দেশের নারীশক্তি স্বাধীনতার রক্তাক্তপথে আগাইয়া চলিয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, ভারতের অন্তর্নিহিত মুক্তির পিপাসা। এই পিপাসার শান্তি আছে কেবল মুক্তির মধ্যে—দৈহিক, মানসিক, সমাজিক, আর্থিক মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির মধ্যে।

বার বার তিনবার

A political scheme that cannot be carried out except by soldiers, will not be a permanent one.

Bernard Shaw.

অবোধ পাঞ্জাব-সরকার ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া সিংহের গুহায় আবার পা দিয়াছে। এই ভুল সে করিয়াছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালা-বাগের প্রান্তরে। তাহার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নন্-কোঅপারেশনের যুগে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট পুনরায় ভুল করিল; এবার গুলি চলিল না বটে কিন্তু আইন অমান্যের আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য সরকার বহু স্বেচ্ছাসেবককে কারাগারে পাঠাইল। কিন্তু পাপের ভরা এতদিন পূর্ণ হয় নাই; লাহোরে সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে নাগরিকগণ উহার প্রতিবাদকল্পে যে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল—পুলিশ তাহার উপর লাঠি চালাইয়া পাপের যেটুকু বাকি ছিল তাহার পূরণ করিয়াছে। এই নৃশংস গুণ্ডামীর ফলে লালাজী, সত্যপাল প্রমুখ নেতৃগণ আহত হইয়াছেন। বার বার তিনবার।

ইতিপূর্ব্বেও সাইমন কমিশন যখন আসিয়াছিল তখন কলিকাতায় লাঠি চলিয়াছিল—মাদ্রাজে গুলি চলিয়াছিল। বাকি ছিল উত্তর ভারত, এবার সেখানেও লাঠি চলিল। উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব ভারতের ললাটে আজ পুলিশের লাঠির দাগ—দিকে দিকে বিভীষিকা জাগাইয়া রক্তসিক্ত পথে সাইমন কমিশন আসিয়াছে—ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনায়। ইতিহাসে এতবড় হাস্যকর ব্যাপার আর কি ঘটিয়াছে?

এই পাঞ্জাবের অমৃতসরে একদিন দশ বৎসরের বালক বিদেশীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহার রক্তদান বৃথা যায় নাই। সেই হত্যাকাণ্ডের নয় বৎসর পরে পাঞ্জাবের সিংহের পাঁজরে লাঠি পড়িল। এই আঘাত কি ব্যর্থ হইবে? আহতসিংহ গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছে—"এই সভামঞ্চ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি, আজ অপরাহ্ণে আমাদের বুকে যে লাঠি পড়িয়াছে—তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে সর্ব্বনাশের পথে আরও একধাপ আগাইয়া দিল।" যুগে যুগে অত্যাচারীর গুলি এমনি করিয়া আপনার শিরে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে। আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের উপর অত্যধিক জোরজুলুম করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একদিন আমেরিকার নগরে নগরে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালাইয়াছিল। আমেরিকা আজ স্বাধীন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের এক রবিবারে রুষিয়ার জার রাজপথে বুভুক্ষু রুষকৃষকগণকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল। রুটি চাহিতে যাহারা আসিয়াছিল গুলি খাইয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ইতিহাসে এই রবিবার 'রক্ত-রবিবার' বলিয়া খ্যাত। জার সেদিন ভাবে নাই—আপনার রক্ত দিয়া তাহাকে একদিন ঔদ্ধত্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছে, তাহার ইষ্ট নির্ভর করিতেছে পুলিশের যষ্টির উপরে, ভীতির উপরে, জনসাধারণের প্রীতির উপরে নহে। তাই সে

বিনাকারণে নিরীহ নাগরিকের উপর লাঠি চালাইতে দ্বিধা করিল না। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। অত্যাচারের পর অত্যাচারে, আঘাতের পর আঘাতে এই ধৈর্য্যের বাঁধ যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায় সহস্র মেশিনগান ও জেপলিনে তখন আর কুলায় না। ইতিহাসে এই বাঁধ ভাঙ্গার নজির অনেক পাওয়া গিয়াছে। বঞ্চিত বুকের রহুকালের সঞ্চিত আক্রোশ ও অভিমান হঠাৎ সহস্রধারায় উদ্দামবেগে কখন দিকে দিকে কান্না জাগাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। সেই বন্যা-ধারায় কত সিংহাসন, কত রাজমুকুট, কত সাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছে; কত চার্লস কত লুই সেই বন্যায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টি-ছাড়া দেশ নহে। এখানকার আকাশে চন্দ্র সূর্য্য কিরণ দেয়; এখানকার মানুষের দেহ রক্ত-মাংসের; সেখানে আঘাত দিলে ব্যথা লাগে; এখানকার মানুষেরও ক্ষুধা আছে, ক্রোধ আছে, অভিমান আছে। গবর্ণমেণ্ট হয়ত মনে করিয়াছে—ভারত-বাসীর রক্ত মাছের রক্তের মত শীতল; হাজার অত্যাচারেও উত্তপ্ত হইবে না—আর যদি কখনও উত্তপ্ত হয়, ভাবনা কি? রেগুলেশন লাঠি আছে, দম্‌দম্ বুলেট আছে, টেগার্ট আছে, ডায়ার আছে—এক নিমেষে সব ঠাণ্ডা করিয়া দিব।

আমরা চাহি না, ভারতবর্ষ রক্তসাগরে ঝাঁপ দিয়া কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করুক। মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ দেশনায়কগণ সেই দুর্দ্দিনের আগমন বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট লাঠির উপর একান্ত নির্ভর করিতে গিয়া সব মাটি করিতে বসিয়াছে। ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা কেবল মহাকালই জানেন।

বিচিত্রা

কালের ইঙ্গিত

"যদি জাগে মহাকাল, উদ্দাম জটা জাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হ'য়োনাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিও তাল—
জয় জয় জয় গান গাইও।"

রবীন্দ্রনাথ

মানব সমাজে পরম দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হইল সেই দিন—যে দিন সঞ্চয়ের বাসনায় উন্মত্ত হইয়া মানুষ দুই হস্তে কেবল ভোগ্য বস্তু আহরণ করিতে লাগিল। মৌমাছিও সঞ্চয় করে—কিন্তু সে সমস্ত মৌচাকের জন্য; লোভাতুর মানুষ সমাজকে নিষ্পেষিত করিয়া সঞ্চয় করিতে লাগিল কেবল নিজের ভোগের জন্য। ইহার ফলে সমাজে ঘোরতর বৈষম্যের সৃষ্টি হইল। তখন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান চিরস্থায়ী করিবার জন্য কৃত্রিম বাঁধ তুলিবার প্রয়োজন আসিল। আইন সমাজের সেই কৃত্রিম বাঁধ। বলা বাহুল্য, বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন ও রক্ষার জন্য বাহুবল ও ছলনার প্রয়োজন। দরিদ্র সর্ব্বহারার দল ক্ষুধার তাড়নায়

আইনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাহাতে ধনীর প্রাসাদে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। সমাজ এমনি করিয়া দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অবশেষে একটা শাসনতন্ত্র খাড়া হইয়া উঠে; এই শাসনতন্ত্র যতদিন পারে অস্ত্রের জোরে দরিদ্র ও ধনী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আইনের কৃত্রিম ব্যবধান রক্ষা করে। তারপর যখন নিরন্ন মানুষের দল ক্ষুধার যাতনা আর সহ্য করিতে পারে না—তাহাদের বেদনার পাত্র কানায় কানায় যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন অকস্মাৎ বিপ্লবের এক দারুণ রাতে লক্ষ মানুষের বুকের রক্ত প্রলয়-দোলায় দুলিয়া উঠে; বহুকাল ধরিয়া সমাজে যে তিক্ত অশ্রুজল জমিয়া উঠিতেছিল—সহসা তাহার ফেনিলোচ্ছ্বাসে বাঁধ কখন ভাঙ্গিয়া যায়; দিকে দিকে বন্যা ছুটে; বৈষম্য লোপ পায়; সমাজ আবার তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। মানব সমাজের ইহাই যুগযুগান্তের ইতিহাস।

এই ইতিহাসের গূঢ় মর্ম্মকথা যখন আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন পঞ্চনদে কেন গুলি চলিল—বামুনগাছিতে কেন শ্রমিক মরিল—বিনা বিচারে আমাদের যুবকগণ কেন বন্দী হইল—এ সব প্রশ্নের অতি সহজ সমাধান হইয়া যায়। বৃটিশ জাতি কেন আমাদিগের দেশ অধিকার করিয়া আছে, আমরা রুটি চাহিলে কেন তাহারা আমাদিগকে পাথরের টুকরা দেয়, সাইমন কমিশনকে পাঠাইবারই বা কি প্রয়োজন—এই সব কথাও তখন আর হেঁয়ালী থাকে না।

বার্ণার্ড শ'য়ের একখানি নাটকে যোদ্ধা ও শিকারী যুবক কইন্ আসিয়া পিতা এ্যাডাম্‌কে বলিতেছে—'বাবা, লাঙ্গল ও বলদ লইয়া এসব তুমি কি করিতেছ? গো মহিষের মত কতকগুলি মানুষ পুষিতে পার না? তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিবে যাহাতে তাহারা অজ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে না পারে।"

কইনের উপদেশ ব্যর্থ হয় নাই। হাল ছাড়িয়া দিয়া একদল মানুষ হাতিয়ার লইয়াছে আর দেশে দেশে গরু ঘোড়ার মত মানুষ পুষিতেছে। এই সব মানুষের দল শ্রমিক আর কৃষক। ভাঙ্গা, সেঁতসেতে জীর্ণ কুটীরে তাহারা বাস করে; প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মাঠে আর কারখানায় তাহাদের দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। অবসন্ন দেহে গৃহে যখন ফিরিয়া আসে তখন ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রী পুত্র তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। মালিকের দল একটী বিষয়ে শুধু উদার; শ্রমিক আর কৃষকের মুখের অন্ন তাহারা কাড়িয়া থাকে বটে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আফিং আর তাড়ি পরিবেশন কবিতে তাহাদের কার্পণ্য কোনদিন দেখা যায় না। নিরন্নদের ঘুম পাড়াইবার জন্য একদিকে যেমন তাড়িখানার বন্দোবস্ত, আর এক দিকে তেমনি বিদ্যালয় বা গোলামখানাও রহিয়াছে; মালিক-গণের মহিমা প্রচারের জন্য অসংখ্য যাযকও নিযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছাত্রগণের নিকট ইংরাজরাজত্বের গুণগান করিতেছেন—বলিতেছেন—অহো! বিধাতার কি দয়া! ইংরাজ না আসিলে বর্গীদের অত্যাচারে দেশে রৌপ্যখণ্ড অথবা কুমারী একটিও থাকিত না! ভাগ্যি শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীরা আসিয়াছিল তাইত' রেল টেলিগ্রাফের মুখ দেখিতে পাই, ছমাসের পথ ছদিনে যাই। অতএব ছাত্রগণ! গাও সবে—"রুল বৃটেনিয়া"। ওদিক হইতে পাদ্রীরা প্রচার করে—"শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! Blessed are the meek; for they are of heaven. ইহকালে যাহারা মুখ বুজিয়া অত্যাচারীর যূপকাষ্ঠে ঘাড় পাতিয়া দেয় পরকালে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ তাহাদের গলায় মন্দারের মালা পরাইয়া দেন।"

কিন্তু ক্ষুধা বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ; বুভুক্ষা বৈকুণ্ঠকেও ভুলাইয়া দেয়। নিরন্ন মানুষের দল 'ভাত দাও' বলিয়া মরিয়া হইয়া উঠে। মালিকের

দল তখন শান্তিজল ছিটানো বন্ধ রাখিয়া গুলি বৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দেয়, কারাগারের অন্ধকার মুক্তির আলোককে গ্রাস করিবার জন্য আসে।

ভারতের সর্ব্বত্র কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নারী আন্দোলন—এ সবের অর্থ কি? বাঁধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা। এ বিদ্রোহ নূতন সৃষ্টির লক্ষণ; মহাকালের ইঙ্গিতে ঝড়ের মত ইহা আসিয়াছে; সকল বৈষম্যকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া ইহা আবার চলিয়া যাইবে। তরুণ ভারত! হাস্যমুখে রুদ্রের এই আবির্ভাবকে অভিনন্দিত কর।

অপরাধী কে?

The soldier is an anachronism of which we must get rid.

Bernard shaw.

সুন্দরবনের বাঘ আর পুলিশের রাগ—এ দুইটার কোনও একটাকে যদি বাছিয়া লইতে হয় তবে বঙ্গদেশের সাড়ে পনর আনা লোক বলিবে, আমরা যমের প্রথমোক্ত চেলাটাকেই চাই। বাঙ্গলার সাপের বিষ ভয়ঙ্কর; কিন্তু তার চাইতেও ভয়ঙ্কর বাঙ্গলার পুলিশ। প্লেগের চাইতেও সে মারাত্মক; তাহার কাছে বালক নাই, বৃদ্ধ নাই, রমণী নাই; তাহার কাছে দয়া নাই, মায়া নাই, প্রেম নাই; তাহার কাছে দেশ নাই, ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বর নাই; দুনিয়ায় তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি জিনিষ হইতেছে তাহার দীর্ঘ রেগুলেশন লাঠি; শিবের চাইতেও তাহার নিকট সত্য তাহার শ্বেতকায় মুনিব; আঠার টাকার তলবের জন্য সে না করিতে পারে হেন কার্য্য নাই। উদরের জ্বালায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া একদা লাঠিয়ালের পেশা সে গ্রহণ করে। মাথায় লাল পাগড়ী দিয়া, পায়ে সাত পাক পট্টি জড়াইয়া খাঁকির প্যাণ্ট ও কুর্ত্তা পরিয়া সে ক্রমে

'চাঁদমারি' করিতে শিখে। প্রভাতে উঠিয়া সে বহুক্ষণ ধরিয়া দাঁতন করে; তাহার পর দেশ হইতে আনীত তাহার পৈতৃক পিত্তলের ঘটীটিকে সে খুব ভাল করিয়া মাজে; পরিশেষে কৌপীন পরিয়া গায়ে ধূলা মাখিয়া তাহার দেশ ভাইদের সঙ্গে কুস্তি করিতে লাগিয়া যায়। পৃথিবীর আর কোনও সংবাদ সে রাখে না; তাহার জন্য আর কোনও শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। কেমন করিয়া বন্দুক ধরিতে হয়, কেমন করিয়া বন্দুকে টোটা পুরিতে হয়, ডান দিকে কখন ফিরিতে হয়, বাঁ দিকে কখন ঘুরিতে হয়, জোরে কখন ছুটিতে হয়, ধীরে কখন যাইতে হয় জীবন ভরিয়া এই শিক্ষাই যন্ত্রের মত সে দিনের পর দিন অভ্যাস করে। প্রাণ যখন তাহার হাঁপাইয়া উঠে তখন সিদ্ধি খাইয়া মাদল বাজাইয়া খুব খানিক সে চীৎকার করে; কাছে তাহার স্ত্রী নাই, মা নাই, পুত্র নাই, পথের পানওয়ালীর সঙ্গে ভাঙাভাঙা বাঙ্গলায় রহস্যালাপ করিয়া তাই সে হৃদয়ের পিপাসা খানিকটা মিটাইয়া থাকে। অল্প বেতনে তাহার চলে না, তাই নিরীহ পথিককে নির্য্যাতিত করিয়া সে ঘুস লইতে শিখে। মাটির মমতা যে জীবনে জানিল না, জ্ঞানের আলোক যে পাইল না, ব্যারাকের পঙ্কিল আবহাওয়ায় বন্দুক ও কুচকাওয়াজ লইয়া যে জীবন কাটাইল—কি জানিবে সে মানুষের প্রাণের মূল্য কতখানি? কি বুঝিবে সে দেশের জন্য দরদ কি? বড় সাহেবের হুকুম তামিল করিতে যে আজীবন অভ্যস্ত, বিবেকের আহ্বান তাহার নিকট অর্থহীন প্রলাপ মাত্র; তাই মহানগরীর পথে পথে দণ্ড লইয়া যমদূতের মত সে যখন মানুষগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকে তখন বিস্মিত হই না; তাই দেশের অর্থে পুষ্ট হইয়া, দেশের অর্থে ক্রীত লাঠিসোটা লইয়া সে যখন সরস্বতীর মন্দিরে ঢুকিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করে তখন আশ্চর্য্যান্বিত হই না; শুধু ভাবি, ইহাদের দোষ

কি? ইহারা ত' শিকারীর দুর্দ্দান্ত কুকুর, কেমন করিয়া মানুষ মারিতে হয় এই শিক্ষাই আজীবন পাইয়া আসিয়াছে। ভদ্রতা ইহাদিগকে কোন দিন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; হৃদয়ের উচ্চতর বৃত্তির সন্ধান ইহারা কোন দিন পায় নাই; জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল চিরস্থায়ী করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেই মানুষ মারা শিক্ষাই ইহারা পাইয়া আসিয়াছে। দুনিয়ার হতভাগ্য জীব—ইহারা কৃপার পাত্র! উদরের জ্বালায় ইহারা বন্দুক ধরিয়াছে; পরের সঙ্কেতে দেশের মাথায় ইহারা লাঠি চালাইয়াছে; ইহারা একদিন মানুষ ছিল, তোমার মত, আমার মতই মানুষ ছিল; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একদিন নির্ব্বিবাদে তাঁত বুনিয়া, চাষ করিয়া খাইত; বিদেশীর অমানুষিক অত্যাচারে দেশের শিল্পব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে; লুণ্ঠিত হৃতসর্ব্বস্ব ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও ইহাদিগকে পথের কাঙাল করিয়া গিয়াছে; আজ ইহাদের খাইবার অন্ন নাই, পরিবার বস্ত্র নাই, মাথা রাখিবার গৃহ নাই। বড় দুঃখে, বড় দারিদ্র্যে মাতাভগ্নীগৃহিণী ছাড়িয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য পুলিশের খাতায় ইহারা নাম লিখাইয়াছে—শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়া ব্যারাকে প্রবেশ করিয়াছে। আজ আর ইহাদিগকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না—ইহাদের হৃদয় আছে বলিয়া মনে হয় না; বোধ হয় যেন ইহারা ধ্বংসের দূত, যমের চেলা, কেবল মাংসপেশীর সমষ্টি মাত্র। তবু ইহারা আমাদের দেশের লোক! আমাদেরই মাটির মানুষ! রাগ ইহাদের উপর হয় না; ক্রোধ হয় ঐশ্বর্য্যলোভী, সাম্রাজ্যগর্ব্বী শাসকদের উপরে যাহারা সাগরগিরিবেষ্টিত, স্বর্গের মত সুন্দর আমাদের এই দেশটাকে আজ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে—লক্ষহাতে আমাদের দেশের কৃষককুলের মুখের অন্ন কাড়িয়াছে; তাহার পর লুণ্ঠিত, অধিকৃত পররাজ্য রক্ষা করিবার জন্য শান্তিরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছে তাহাদেরই—যাহাদের

পূর্ব্বপুরুষের জমাট বক্ষরক্তে ইংরাজের সাম্রাজ্য-সৌধের প্রত্যেকখানি ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজ যদি তৈমুর অথবা নাদিরের মত অকস্মাৎ একদিন আমাদের দেশে আসিয়া সহস্র সহস্র নর নারীকে কাটিয়া ফেলিত, তাহার পর লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া সাগর পারে আবার একদিন দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইত তাহাতে ততবেশী ক্ষতি ছিলনা; কিন্তু সে আজ আমাদিগকে তিলে তিলে পলে পলে মারিতেছে; সে আজ আমাদিগের কেবল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না—আমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিকেও সে আজ ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিতেছে। দেশের ঐশ্বর্য্য লুটিয়া খাইতেছে—এ দুঃখ কথঞ্চিৎ পরিমাণে সহনীয়; কিন্তু যখন দেখি দেশের সহস্র সহস্র ভাইকেও শাসকগণ রাজ্যরক্ষার জন্য এক একটা হৃদয়হীন পশু করিয়া তুলিতেছে—তখন দুঃখ রাখিবার আর ঠাঁই থাকে না।

স্বাধীন দেশ হইলে আজ যাহারা প্রকৃতির শ্যামল প্রান্তরে সরল কৃষকের জীবন যাপন করিত, অথবা প্রয়োজন হইলে দেশের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অসি হস্তে অগ্রসর হইত, দেশ পরাধীন বলিয়া তাহারাই আজ শিক্ষার অভাবে, উদরের জ্বালায়, ভায়ের মাথায় অন্ধের মত লগুড়াঘাত করিতেছে, জননী জন্মভূমির শৃঙ্খলপাশ আরও দৃঢ় করিয়া দিতেছে! হতভাগ্যের দল জানে না তাহারা দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে! মানুষের আত্মার এই শোচনীয় চরম দুর্গতি সত্যই অসহনীয়।

কলিকাতায় হরতালের দিন শান্তি রক্ষার নামে শয়তানের যে বীভৎস উৎসব চলিয়াছে তাহার জন্য একমাত্র পুলিশের জুলুমকেই আমরা একান্ত করিয়া দেখিব না। গুণ্ডামির জন্য পুলিশও যতখানি অপরাধী তাহার হাতের লাঠিটাও প্রায় তদ্রূপই অপরাধী, অর্থাৎ পুলিশের হাতে তাহার লাঠিটা যেমন কার্য্যসিদ্ধির একটা অন্ধ যন্ত্রমাত্র কর্ত্তাদের হাতে পুলিশও সেইরূপ স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র।

মানুষ যতদিন সচেতন জীব হইয়াও শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে অচেতনের মত রহিবে ততদিন তাহাকে দিয়া একদল স্বার্থান্ধ অর্থলোভী জীব সর্ব্বপ্রকার অমানুষের কার্য্য করাইয়া লইবে, ততদিন দেশে দেশে হত্যা চলিবে, দস্যুতা চলিবে, লুণ্ঠন চলিবে। আজ তাই চাই সর্ব্বত্র জ্ঞানের আলোক, শিক্ষার প্রসার, দেশাত্মবোধের জাগরণ। হরতালের দিনে তাহা হইলে রাজপথে মানুষ আর অপরের ইঙ্গিতে পশুর মত কার্য্য করিবে না। গুণ্ডামি ছাড়িয়া সে দেশমাতৃকার পূজা করিতে শিখিবে, লাঠি ফেলিয়া শান্তির শ্বেতপতাকা সে ধারণ করিবে, নিরীহ পথিকের রক্তপাত না করিয়া দেশের ও দশের জন্য আপনার হৃদয়রক্ত দান করিয়া ধন্য হইবে।

সিগার, শ্যাম্পেন ও মোটরকার

Life, apart from man is not a happy spectacle. It is a flight and a chase, a craving, famished business and a round of assasination.

Wells

সিগার শ্যাম্পেন আর মোটরকার—ইহার জন্য ধনিকের দল না করিতে পারে হেন কার্য্য নাই। শ্রমিকের বুকের কলিজা পিষিয়া রথ তাহাদের ধাইয়াছে ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে; তাহাদের বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গঙ্গার ধারে ধারে পাটের কলে নিরন্ন মানবের দল বক্ষ নিঙাড়িয়া রক্ত ঢালিতেছে; আসামের চা বাগানে কুলির দল কালাজ্বরে দলে দলে মরিতেছে; ঝরিয়ার কয়লাখাদের বায়ুশূন্য অন্ধকারে গর্ভবতী নারীগণ প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিতেছে; ৮।১০ বৎসরের কচিকচি বালকদের পরিত্রাণ নাই; কারখানার রুদ্ধ হাওয়ায় চারি আনা মজুরির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদিগকেও খাটিতে হয়। এমনি করিয়া দুনিয়ায় এক শ্রেণীর লোক মরিতেছে; একদল সারাজীবন ধরিয়া ঠকিতেছে—আর একদল তাহাদিগকে কেবলই ঠকাইতেছে; একদল সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও উপযুক্ত মজুরির অভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় সারারাত কঠিন মৃত্তিকা-শয্যায়

ছটফট করিতেছে—আর একদল তাহাদেরই পরিশ্রমের অর্থে পেলিটির হোটেলে শ্যাম্পেনের স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে; একদল বর্ষার রাতে ভগ্ন-অপরিচ্ছন্ন কুটিরে গরু ছাগলের সঙ্গে না ঘুমাইয়া কাটাইতেছে—আর একদল দীপালোকিত সুসজ্জিত কক্ষে নৃত্য করিয়া, বিলিয়ার্ড খেলিয়া নিশাযাপন করিতেছে; একদল শীতের রাত্রে বস্ত্রের অভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—আর একদল র‍্যানকিনের বাড়ীতে মাসে শত শত টাকার পোষাক তৈয়ারী করাইতেছে। আধুনিকসভ্যতার ইহাই বিশেষত্ব।

কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। ক্ষুধার যাতনা যখন চরমে উঠে অথচ অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ যখন মেলেনা নিরুপায় মানুষ তখন ধনিকের দ্বারে ছুটিয়া থাকে একমুষ্ঠি অন্নের দাবী লইয়া। তাহারা বলে —"প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আলপিন হইতে জাহাজ পর্য্যন্ত আমরাই সব গড়িতেছি; রেল ষ্টীমার আমরাই চালাইতেছি, খনি হইতে তেল কয়লা সোনা লোহা আমরাই তুলিতেছি; অট্টালিকা আমরাই নির্ম্মাণ করিতেছি। বস্ত্র আমরাই বুনিতেছি; লাঙ্গলের মুখে ফলে শস্যে তোমাদের ক্ষুধা আমরাই মিটাইতেছি;—আমরা কিছু চাহিনা; শেরি শ্যাম্পেন মোটরকার তোমাদেরই থাক তোমাদিগের ঘোড়দৌড়, বিলাস নৃত্য, রঙ্গরস পুরাদমে চলিতে থাকুক; আমাদিগকে পেট ভরিয়া দুইবেলা খাইতে দাও।" হায়! শুধু অরণ্যে রোদন; উদ্ধত ধনিক নিরন্ন মানুষের হাহাকারে কর্ণপাত করে না, শুধু অস্ত্রধারী গুর্খার দলকে ইঙ্গিত করে; উদ্যত রাইফেল হইতে অমনি মুহুর্মুহু বজ্রনাদ হইতে থাকে, এক মুষ্ঠি অন্নের আবেদন লইয়া ধনিকের দ্বারে যাহারা আসিয়াছিল উত্তপ্ত সীসকখণ্ড লাভ করিয়া তাহারা চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে 'উৎফুল্ল' মালিকের দল 'ক্লাবে'

ফিরিয়া যায়; কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রমিকের বিধবা মৃতস্বামীর রক্তাক্ত দেহের উপর লুটাইয়া পড়ে; পিতৃহীন শিশুদল শবদেহ ঘিরিয়া হাহাকার করে। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন; যথাসময়ে ইস্তাহার বাহির হয় এবং তাহাতে লেখা থাকে—দুর্দ্দান্ত কুলিরদল ক্ষিপ্ত হইয়া শান্তিরক্ষকগণকে আক্রমণ করিয়াছিল; বাধ্য হইয়া পুলিশকে গুলি ছুড়িতে হইয়াছিল; গুলি না চালাইলে গুণ্ডারদলের অত্যাচারে পুলিশের ও সাধারণের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিত।" উদরের জ্বালায় যাহারা চক্ষে জল এবং কণ্ঠে হাহাকার লইয়া আসিয়াছিল, মানুষের বিরুদ্ধে যাহাদের একটী অঙ্গুলিও উত্তোলিত হয় নাই, যাহাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—মাথা রাখিবার একটু স্থান, লজ্জা নিবারণের একটু বস্ত্র এবং ক্ষুধা মিটাইবার জন্য দুইবেলা দুইমুষ্টি অন্ন—গুর্খার গুলিতে মরিয়া এবং গুণ্ডার কলঙ্ক লইয়া তাহারা চিরদিনের জন্য পৃথিবী ছাড়িয়া গেল!

হাওড়া হইতে দশ হাজার শ্রমিক কলিকাতায় ফেয়ারলি প্লেসে রেলওয়ে এজেন্টের নিকট তাহাদের আবেদন জানাইবার জন্য গিয়াছিল। দশ হাজার ক্ষুধিত মানুষের যাত্রা; পথে গাড়ী ঘোড়ার চলাচল বন্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু একটী দোকানেরও ক্ষতি হয় নাই, একটী মানুষের গায়েও আঁচড় লাগে নাই। ইংলণ্ডে এরূপ ঘটনা ঘটিলে অশান্তির ঝড় বহিয়া যাইত। এজেন্ট সাহেব তাহাদের ২০ জন প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলেন কিন্তু তাহাদের দুঃখের কোনও প্রতিকার হইল না; মালিকের নির্ম্মম প্রতিনিধি নির্ম্মম ভাষায় শ্রমিকদিগকে বলিলেন—কোন কথা শুনিব না; কাজে ফিরিয়া যাও।

শুষ্ক মুখে ক্লান্ত পদে বুভুক্ষু শ্রমিকের দল নিরাশ হৃদয়ে গৃহপানে ফিরিয়া চলিয়াছে। প্রভাতে তাহারা আসিয়াছিল; কর্ত্তৃপক্ষের মুখে

একটী আশার বাণী শুনিবার জন্য সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল। আশায় তাহাদের এখন ছাই পড়িয়াছে; ক্ষুধায় তাহাদের দেহ অবসন্ন; সম্মুখে তাহাদের অনশন ও কঠোর সংগ্রাম। বাড়ী ফিরিবার জন্য স্বভাবতই তাহারা ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু পথে একি বিঘ্ন! বামুনগাছির পুলের নিকট একদল গুর্খা কিছুতেই তাহাদিগকে সেতু পার হইতে দিবে না, অথচ তাহাদের গৃহে ফিরিবার আর কোন পথই ছিল না। সারাদিন যাহারা আহার করে নাই, মন যাহাদের নৈরাশ্যে তিক্ত, অত্যাচারের পর অত্যাচার যাহারা নীরবে এতদিন সহ্য করিয়াছে—এই নূতন অত্যাচারে ধৈর্য্যের বাঁধ তাহাদের ভাঙিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া যদি ঢিল ছুড়িয়া থাকে সে এমন কিছু বিচিত্র নহে। মনে রাখিতে হইবে তাহারা মানুষ। সৈনিক-দল সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়িয়া ঢিল ছোড়ার প্রত্যুত্তর দিল। হতাহত শ্রমিকের রক্তে ধরণী রঞ্জিত হইল।

পৃথিবীতে যতদিন জনসাধারণের ভাগ্য অর্থলোভী, পরশ্রমজীবি, মুষ্টিমেয় ধনিকের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বামুনগাছির অভিনয় বারে বারে চলিবে। পরের পরিশ্রমে পুষ্ট ধনীর দল কখনও দেহজীবিগণকে শক্তিশালী হইতে দিবে না। তাহারা দেখিতেছে শ্রমিকের দল সর্ব্বত্র সংঘবদ্ধ হইতেছে। পাছে শক্তি তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যায় এই ভয়ে সবদেশের ধনিকেরাও আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতেছে। শ্রমিকদের মুক্তি নির্ভর করিতেছে কিসের উপরে? তাহাদের সংঘবদ্ধ হইবার ক্ষমতার উপরে। যে দিন তাহারা নিজেদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হইবে—সচেতন হইয়া বুঝিবে, কাহারা তাহাদের দুঃখের জন্য দায়ী এবং সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া আপনা-দিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবে—সেই দিন তাহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

নব্য-সাহিত্যের রূপ

There is no vital art save that which is linked with the rest of humanity.

Romain Rolland

বিশ্বমানবের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ও সুখদুঃখের সঙ্গে যে সাহিত্যের যোগ নাই—সে সাহিত্যে প্রাণশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবল নিজের কথাকে রূপ দিয়া বড় সাহিত্যের সৃষ্টি করা যে অসম্ভব এমন কথা বলি না। পৃথিবীতে এমন বড় সাহিত্যিকের অভাব নাই যাহাদের সাহিত্যে কেবল তাহাদের নিজের কথাই প্রতিফলিত হইয়াছে। তবুও বলিব—সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বলতম গ্রহ তাঁহারাই যাঁহারা কেবল কল্পনা-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ান নাই—যাঁহারা মানুষকে ভালবাসিয়াছেন, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খাকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন এবং সেই অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিয়াছেন। এমন একদিন ছিল যে দিন সাহিত্য রাজা উজির বাদসা বেগমদের খাস মহলের বিচিত্র কাহিনী লইয়া মসগুল ছিল। যে বৃহৎ মানবপরিবার

রাজপ্রাসাদের আড়ম্বরের বাহিরে সুখদুঃখ হাসিকান্নার মধ্যে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে সে দিনের সাহিত্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

আজ মানুষের দৃষ্টি নূতন আলোক লাভ করিয়াছে। এই নূতন আলোকে আমরা কি দেখিতেছি? দেখিতেছি—সাধারণ মানব মানবীর জীবনের মহিমা। যাহাদিগকে এতদিন ক্ষুদ্র ভাবিয়া আমরা তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি আজ দেখিতেছি সেই ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাটের আসন—তুচ্ছের মধ্যে দেবতার গরিমা।

আজ যাহারা নব্যসাহিত্য রচনার কাজে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদের ব্রত সুকঠিন। মানবসমাজে যাহা বিরল—যাহা অস্বাভাবিক তাহার বর্ণনায় শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ কি? যাহারা সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখময় জীবন হইতে সরিয়া গিয়া কৃত্রিম জীবন যাপন করিতেছে সেই মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনের চিত্র এখন না আঁকিলে ক্ষতি নাই। নব্য সাহিত্যের কাজ হইবে প্রতিদিনের সহজ জীবনের সুরকে সাধারণের কাছে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। এই সাধারণ মানুষের জীবন সমুদ্রের অপেক্ষাও গভীর এবং বিপুল। আমরা যদি আমাদের অনুভূতিকে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারি তবে দেখিব সেখানকার প্রতিদিনের জীবনের লীলা হাসি ও অশ্রুজলে মিশিয়া বৈচিত্র্যে এবং মাধুর্য্যে রামধনুকেও হার মানাইয়াছে। Victor Hugo যখন তাঁহার লা মিজারেবল্‌সে কয়েদীর জীবনের নিগূঢ় বেদনাকে রূপ দিলেন তখন চোর আর শুধু চোর রহিল না—তাহার অপরাধের কালিমা ঢাকা পড়িয়া গেল সমাজের এবং রাষ্ট্রের প্রাণহীন অন্ধ আইনের চক্রের অন্তরালে। জিন্ ভ্যালজিন্ আমাদের কাছে নূতনরূপে দেখা দিল। ক্ষুদ্রের মধ্যে আমরা বিপুলকে আবিষ্কার

হউক ; তাহার মধ্যে মানুষের বেদনা ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠুক। মেঘ-রাজ্যের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি ; এবার শুনিতে চাই মাটীর বুকের ক্রন্দন—দিবস রজনীর স্পন্দন—প্রকৃতির অন্তঃপুরের বিচিত্র সঙ্গীত, এবার শুনিতে চাই—মহামানবের বেদনার সুর—"The still sad music of humanity."

বৈশ্যযুগ

আমাদের সভ্যতার সাজসরঞ্জাম যে অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে উহার সৌন্দর্য্যবোধ ঠিক সেই অনুপাতে কমিয়া আসিতেছে। নূতন নূতন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইতেছে—নূতন নূতন অট্টালিকা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—যানবাহনের পথের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী এবং জল-জাহাজ জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ছাইয়া ফেলিতেছে। সভ্যতার কলেবর বিজ্ঞানের দানে দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জগত কি পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে?

বর্ত্তমান সভ্যতা এই প্রশ্নকে স্বপ্নবিলাসী ভাবুকের পাগলামী বলিয়া উড়াইয়া দিবে—কারণ জগৎ সুন্দর হইতেছে কি অসুন্দর হইতেছে—এই সভ্যতার তাহা ভাবিবার অবসর নাই। ইহা অন্ধভাবে ফ্যাসানের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই ফ্যাসানের দ্বারদেশে যে প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে সে জিজ্ঞাসা করে না—'তুমি কেমন লোক'। সে শুধু জিজ্ঞাসা করে—'তুমি আমায় কত টাকা দিতে পার'। যাহার পকেটে সোনার মোহর ঝমঝম্ করে, দ্বারী তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয়—সমাজে সে উচ্চ আসন দখল করিয়া বসে। যাহার টাকা নাই, সভ্যতার দরবারে তাহার

আসনও নাই। সমাজ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখে। এখনকার দিনে ব্যাঙ্কে যাহার টাকা আছে সে সর্ব্বজয়ী; তাহার চিন্তার ভাণ্ডার শূন্য হউক—তাহার মনুষ্যত্ব অথবা পাণ্ডিত্য থাকুক বা না থাকুক—তাহার সুখ ও সম্মান সর্ব্বত্র। এই যুগ হইতেছে বৈশ্যের যুগ—ব্যবসাদারীর যুগ. এই যুগে কুলীন মাত্র সেই যাহার কাঞ্চণের অভাব নাই।

জগৎ আজ বৈশ্যশক্তির দাসত্ব করিতেছে বলিয়া বাহিরের উপাদান ও সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু কবি ও ভাবুকের যে দৃষ্টি নব নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে—সেই সৌন্দর্য্যবোধ বৈশ্য কোথায় পাইবে? তাই বিশ্ব আজ সৌন্দর্য্যের কাঙাল হইয়া পড়িয়াছে। এই সৌন্দর্য্যের অভাব আজ দিকে দিকে মানুষের অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। সহরের আকাশ ধূমজালে সমাচ্ছন্ন; গঙ্গার উভয় তীরে কলগুলি ক্রমাগত ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া দৈত্যের মত গর্জ্জন করিতেছে—বনের গাছগুলি কাটিয়া সব উজার করিয়া দিতেছে;—মেঘলোক পর্য্যন্ত মানুষের কুঠার পৌঁছায় না তাই রক্ষা—নহিলে সান্ধ্য মেঘের বর্ণশোভা হইতেও মানুষ হয়ত বঞ্চিত হইত।

এই সৌন্দর্য্য-বোধের অভাব আমাদের জীবনের সবদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে গৌণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনকেই মুখ্য করিয়াছে—নানা প্রকারের আবর্জ্জনায় বাজার ভরিয়া ফেলিতেছে। শিল্পী শিল্প কার্য্য করে অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—সৌন্দর্য্যের দিকে পিছন ফিরাইয়া। আমাদের গৃহগুলিও সস্তা জাপানী আসবাবে ও সস্তা বিলাতী চিত্রে ভরিয়া উঠিতেছে—সত্য সত্যই যাহার মধ্যে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের প্রকাশ আছে এমন সব বস্তু দূরে নির্ব্বাসিত হইতেছে—কল কারখানা আসিয়া মানুষের মৌলিক সৃষ্টির প্রতিভাকে ম্লান করিয়া দিতেছে।

আমাদের আফিসগুলিতেও বৈশ্য যুগের সব লক্ষণ প্রতিফলিত হইয়াছে। কাঠের চেয়ার, কাঠের টেবিল, ইটের দেয়াল—কাঁচের সারসি—কাগজের তাড়া সব এক ঘেয়ে, সব নীরস—কোথাও সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র নাই;—কাজ এবং টাকাই একান্ত বড হইয়া উঠিয়াছে—সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর সেথানে প্রবেশের কোনও অধিকার নাই; আনন্দ সেখান হইতে নির্ব্বাসিত। অবশ্য আফিসে টেবিল হারমোনিয়াম থাকিবে এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু দেওয়ালে যদি দুই চারি খানি সুন্দর ছবি থাকে, বারান্দার টবে যদি রঙ্গীন ফুলের কয়েকটা গাছ থাকে, আফিসকে যদি আরও নানাদিক দিয়া সুন্দর করিয়া তোলা যায় তাহাতে কাজের ক্ষতি হইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না বরং তাহার ফলে মানুষের কাজ করিবার শক্তি আরও বাড়িয়া যাইবে। সুন্দর মানুষকে চিরদিনই আনন্দ দান করিয়া থাকে—ইহাও যেমন সত্য আনন্দ মানুষের কাজ করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয় ইহাও তেমনি সত্য। কিন্তু হৃদয়হীন বৈশ্যযুগ এই সহজ সরল কথাটা বুঝিতে চাহে না। সে মনে করে, সৌন্দর্য্য স্বপ্নবিলাসীর জন্য, কাজের মানুষের জন্য নহে। এই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত বর্ত্তমান সভ্যতা সুন্দরের গলে বরণ মাল্য কবে অর্পণ করিবে? কতকাল সে রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় বিরহিনী সীতার মত বন্দিনী হইয়া রহিবে?

ঘরোয়া বিবাদ

A house divided against itself cannot stand.

Abraham Lincoln

বাহিরের শোষণে এবং শাসনে দেশের জীবনীশক্তি যেখানে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে সেখানে ঘরোয়া-বিবাদ আত্মহত্যারই নামান্তর। বাঙ্গলার কয়েকটী জিলায় এই বিবাদ দিন দিন তীব্র হইয়া উঠিতেছে ; ইহার দ্বারা আমরা ঘরকে যে পরিমাণে দুর্ব্বল করিতেছি বাহিরকে ঠিক সেই পরিমাণে সবল করিয়া তুলিতেছি।

যেখানে বহু প্রকৃতির বহুলোক একত্র আসিয়া মিলিত হয় সেখানে কলহ অবশ্য অস্বাভাবিক নহে। ঘরেও অনেক সময়ে স্বামী স্ত্রীতে, ভায়ে ভায়ে কলহ হইয়া থাকে ; সুতরাং, কলহের নামেই যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হইবে এমন কোন মানে নাই। শুধু ইহাই নহে। বিচ্ছেদ অনেক সময়ে প্রাণশক্তির লক্ষণ। যেখানে লোকে নূতন পথে চলিতে পারে, নূতন ভাবে ভাবিতে পারে সেখানে যাহা জীর্ণ এবং পুরাতন তাহার সহিত নূতনের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আলোক এবং

অন্ধকার, ভালবাসা এবং বিদ্বেষ, মুক্তি এবং বন্ধন একত্র থাকিতে পারে না। গোঁজামিল দিয়া কোনও প্রকারে শান্তিরক্ষা চলিতে পারে; কিন্তু প্রাণ যেখানে জাগিয়াছে অশান্তি ও বিচ্ছেদ সেখানে আসিয়াছে। এই বিচ্ছেদ ও অশান্তিকে আমরা সকল সময়ে যেন অকল্যাণ বলিয়া ভুল না করি। আলোর মধ্যে সন্তানের জন্ম হয় তাহার মায়ের সহিত বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া।

কিন্তু একটী কথা। স্বাধীনতার সংগ্রামে ঘরোয়া-বিবাদ অনিবার্য্য বলিয়াই ইহাকে যে অযথা বাড়াইয়া তুলিতে হইবে এমন কোনও অর্থ নাই। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ক্রমাগত উপদেশ দিয়া থাকেন—দেশের সকল দল এক না হইলে স্বাধীনতা আসিবে না; অতএব যে কোন মূল্য দিয়াই হউক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। আমরা এরূপ আকাশ-কুসুমে বিশ্বাস করি না। দেশের এমন লোক কিছু না কিছু থাকিবেই—যাহারা নিজেদের স্বার্থ পাছে ক্ষুণ্ণ হয় সেই ভয়ে বিদেশীদের সহিত যোগ দিয়া আমাদের মুক্তি লাভের পথে বহু অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে। এই সব লোকের সহিত একই দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহাদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধিবেই বাধিবে।

কিন্তু বুঝিতে হইবে, ঘরের মধ্যে এই সংঘর্ষ যত কম হয় ততই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ; কারণ নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেই যদি আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায় তবে বাহিরের প্রবলতর শত্রুর ব্যূহভেদ করিব আমরা কেমন করিয়া?

সুতরাং গৃহ-বিবাদকে যেমন নিছক ভাল বলা চলে না তেমনি নিছক মন্দও বলা চলে না। তবুও একথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে—পরাধীন দেশে ঘরোয়া বিবাদ ভাল অপেক্ষা মন্দ ফলই প্রসব করিয়া থাকে। স্বাধীনদেশে বহিঃশত্রুর আশঙ্কা না থাকায় ঘরোয়া বিবাদ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরগুলির মধ্যে একটী। একদল জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক এই চূড়াটীতে পৌঁছিবার জন্য কালিম্পং সহরে পৌঁছিয়াছেন। কালিম্পং হইতে সিকিম হইয়া তাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার অভিমুখে অভিযান সুরু করিবেন। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

আমাদের মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে, ইউরোপীয়গণ অত্যন্ত ভোগবাদী। তাহারা ভোগবাদী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের ভোগের মধ্যে তামসিক জড়ত্ব নাই, তাহার মধ্যে বীর্য্য আছে। তাহারা মরিতে জানে, ত্যাগ করিতে জানে—সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য দুঃখ বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে জানে। হিমালয়ের গুপ্ত রহস্য জানিতে গিয়া কত নির্ভীক পুরুষ তুষারের মধ্যে প্রাণ দিল কিন্তু তাহাদের যাত্রা আজও থামিল না। একদল মরিতেছে, ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে—আর একদল নবীন উদ্যমে আসিতেছে। সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য অজানার অভিসারে মানুষের এই যে যাত্রা, মৃত্যু-ভয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করিবার

জন্য মানুষের এই যে আত্মদান, এই যে দুর্জ্জয় সংকল্প, সত্যকে জানিবার অদম্য আকাঙ্খা যাহা দুর্গম শৈলশিখর, দুরতিক্রম্য মরুভূমি, অজানা মহা-সমুদ্র, বন্যজন্তু-সমাকুল গহন কানন—কোন কিছুকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—এই খানেই ইউরোপীয় সভ্যতার যাহা কিছু গৌরব এবং মূল্য। ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতাকে নিশ্চিত বিনাশের হাত হইতে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নতুবা ভোগের কারাগারে পচিয়া পচিয়া উহা কোনদিন দমবন্ধ হইয়া মারা যাইত।

কিন্তু আমাদের অবস্থা হইয়াছে পাশ্চাত্যের অনেকটা উল্টা। আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ত্যাগের বড়াই করি—বুদ্ধের এবং চৈতন্যের নজির দিই—কিন্তু যে বীর্য্য থাকিলে ত্যাগ মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই বীর্য্য আমাদের নাই। আমরা পাই না—তাই ভোগ করি না—আমাদের ত্যাগ কাঙালের ক্রন্দনে পরিপূর্ণ।

এই ত্যাগের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে, আধ্যাত্মিকতার নাম-গন্ধ নাই। আধ্যাত্মিক শক্তিও শক্তি—এই শক্তি যদি আমরা সত্যসত্যই অর্জ্জন করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের জাতীয়-জীবন এত দিনে রূপান্তরিত হইয়া যাইত;—দৈন্যজীর্ণ কক্ষে অপমানের ধূলিতলে ক্লৈব্যের কলঙ্কে এমন কলঙ্কিত হইয়া উঠিত না।

আমাদের এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে শক্তিসাধনার, যে সাধনায় ব্রতী হইয়া আমরা জগৎকে ভোগ করিতে পারিব। যে বীর্য্য আমাদিগকে ভোগের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে—সেই বীর্য্যই আমাদিগকে ত্যাগের গৌরবেও মণ্ডিত করিবে।

বর্ষ-বিদায়

"I am not afraid of thee, O Night, thou devourer of suns! For one star that is put out, thousands are lit up."

Romain Rolland.

পুরাতন-জীর্ণ-বরষের ক্লান্ত-রবি দিগন্তের পারে ঐ ডুবিয়া যায়; দিবসের চোখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে; বনের কোটরে পেচক ডাকিয়া উঠে, চৈত্রের উদাস-বাতাস বেণুবনে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মহা-কালের গর্ভে এমনি করিয়া কত দিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যুগ-যুগান্তর বিলীন হইয়া গিয়াছে; কত ফুল ফুটিয়াছে, কত ফুল ঝরিয়া গিয়াছে; কত মানুষ জন্মিয়াছে, কত মানুষ মরিয়াছে; কত রাজ্য উঠিয়াছে; কত রাজ্য ভাঙিয়াছে। কালতুরঙ্গমের গতির তবুও বিরাম নাই।

মুমূর্ষু চৈত্রের পাণ্ডুর মুখচ্ছবির দিকে চাহিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বসন্তের শেষ দীর্ঘশ্বাসে ফুলের পাঁপড়ি ঝরিয়া যায়; অস্তরবির ম্লান আলোয় পুরাতন বৎসরের জীর্ণতটের উপর দাঁড়াইয়া ঝরাফুলের রক্তহীন

ওষ্ঠে মৃত্যুর হাসি দেখিতে পাই ; আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় কে যেন বলিয়া উঠে—মৃত্যু, মৃত্যু, সকলের পরিণাম—মৃত্যু। ভয়ে দেহের প্রতি রোম-কূপে ঘর্ম্ম ছুটে, মর্ম্ম আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, আশা মিলাইয়া যায়, স্বপ্ন পলায়ন করে, কানের কাছে অশরীরী-সহস্র-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে—ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস—সকলের পরিণাম ধ্বংস ; বৈশাখের মরুবক্ষে বসন্তের চির-সমাধি ; দিবসের চক্ষে রাত্রির চির অন্ধকার।”

তারপর রাত্রি যত অগ্রসর হইতে থাকে, অন্ধকার যত গাঢ় হইয়া আসে, নৈরাশ্য ততই বাড়িয়া যায়। আঁধার যখন চরমে উঠে, হঠাৎ তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব্বদিগন্তে আলোর ধারা ছড়াইয়া পড়ে, নিদ্রিত মৌন বন বিহঙ্গগীতে জাগিয়া উঠে, উপবনের শূন্যসাজি নূতন ফুল আসিয়া ভরিয়া দেয়।

নূতন প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মানুষের আঁখির আবরণ খসিয়া পড়ে ; নূতন ভাবে জগতকে সে দেখিতে আরম্ভ করে। অন্ধকারই জগতে একান্ত সত্য নয়—আলোকও সত্য ; দিবসের চোখে রাত্রি আসে—নূতন আলোকে তাহাকে জাগাইবার জন্য ; ফুল ঝরিয়া যায় নূতন ফুলকে স্থান দিবার নিমিত্ত ; মৃত্যুর পশ্চাতে হাততালি দিয়া আসে জীবন—ক্ষতিকে ছাপাইয়া উঠে লাভ।

আমরা কাঁদিব না, আমরা নিরাশ হইব না, আমরা ভয় পাইব না। পুরাতন যদি সরিয়া যায় যাউক—সম্মুখে নূতন আশার ডালি সাজাইয়া নববর্ষ হাসিতেছে। অন্ধকারের পরপারে আমরা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিব—‘মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ’—সেই অসীম প্রাণের বন্দনা-গান আমরা গাহিব। অতীতের পরাজয় আমরা ভুলিব—অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের যবনিকা আমরা তুলিব। যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাক ;—ভুল-ভ্রান্তি-পাপ সব অতীতের গর্ভে

চিরদিনের জন্ম বিলীন হউক। দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমরা শঙ্কিত হইব না। যাহা কিছু আসে অসীমের মঙ্গল-হস্তের দান বলিয়া তাহাকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিব।

ভবিষ্যতের অজানা গর্ভে কি আছে আমরা তাহা জানি না। শুধু এই জানি—নূতনের মাঝে চির-পুরাতনের বাস; জীবনের প্রতি মুহূর্তের উপর অসীমের পদচিহ্ন। মূঢ় যাহারা তাহারাই ছিন্ন-মালার ভ্রষ্ট কুসুম কুড়াইতে ছুটে; বীরের দল নদী-জলে-পড়া আলোর মতন ঝলকে ঝলকে ছুটিয়া যায়। অতীতের ঘাটে ঘাটে জীর্ণ তরী লইয়া তাহারা ভাসিয়া বেড়ায় না—মাঝ সমুদ্রের বুকে অনিশ্চিতের গর্ভে তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসে ঝাঁপ দেয়। পুরাতনের পাণ্ডুর ওষ্ঠে আজ বিদায়-চুম্বন আঁকিয়া দিয়া এস যাত্রীদল! আমরা নূতনের হাত ধরিয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করি।

বর্ষার দিনে

সজল মেঘে আকাশ ছাইয়া বাদল আসিল। বনের বুকে কদম্ব ফুটিল, নদীর কণ্ঠে সঙ্গীত জাগিল, বিরহীর চোখে অশ্রু ঝরিল। বর্ষা আসিয়াছে। এমনই দিনে কালিদাস তাঁহার মেঘদূত লিখিয়াছিলেন। গগনে এলোচুল ছড়াইয়া নববর্ষা দেখা দিয়াছে; তমালকুঞ্জতিমিরে দাত্রী ডাকিতেছে; সজল সমীরে যূথী-পরিমল ভাসিয়া আসিতেছে; বিরহিণীদের বুকে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা ঘনাইয়া উঠিয়াছে: বর্ষা আসিয়াছে। ভবন-শিখরে পুরনারী করতালি দিয়া ময়ূরকে নাচাইতেছে, সেই নৃত্যের তালে তালে তাহাদের কঙ্কণ বাজিতেছে, অভিসারিকা নিবিড় অন্ধকারে নগরের পথে অভিসারে চলিয়াছে, বধূগণ কেতকী সুবাসে কেশপাশ সুরভি করিয়া বল্লভ জনের আশাপথ চাহিয়া আছে— এমনি কত না চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া কালিদাস বর্ষাকে তাঁহার কাব্যে অমর করিয়া গিয়াছেন।

শুধু কি কালিদাস? রাধার বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণও কি বর্ষাকে আমাদের কাছে অমর করিয়া তুলেন নাই? আকাশে নূতন মেঘের উদয় হইয়াছে। সেই মেঘের শ্যামশ্রীর দিকে

চাহিয়া রাধার দু'চোখ ভরিয়া অশ্রু ঝরিয়াছে; বর্ষার রাত্রি; আকাশে মেঘের গুরুগর্জ্জন,—জমাট অন্ধকারে দিগন্ত ছাইয়া গিয়াছে—পথে পথে বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সেই সর্পসঙ্কুল পিচ্ছিল পথে একাকিনী রাধা প্রিয়তমের অভিসারে চলিয়াছেন—কণ্টকে তাঁহার কোমল চরণ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

আবার এই বর্ষার ঝুলনের দিনে যমুনার তীরে মিলনের সে কি উৎসব! নীপশাখে সখীগণ দোলনা বাঁধিয়াছে; সেই দোলনায় কৃষ্ণ এবং রাধা; সখীগণ প্রেমিকযুগলকে দোলাইতেছে, আর তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের মধুর সঙ্গীতে বনভূমি মুখরিত; নীলনির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে; কুসুমপরাগ ঝলকে ঝলকে ঝরিতেছে—বর্ষা এমনি করিয়াই ভারতের কবির কণ্ঠে আনন্দের ও বেদনার গান জাগাইয়াছে।

আজ বিংশ শতাব্দীর কর্ম্ম-কোলাহল-ময় সংসারে প্রকৃতিকে লইয়া আনন্দ করিবার সময় নাই; মানুষের আজ ছুটি নাই, অবসর নাই—তাহার কেবল কাজ আর কাজ। বর্ষা তাই নবমেঘে মাদল বাজাইয়া কখন চলিয়া যায়—তাহার আনন্দে যোগ দিবার আমাদের সময় নাই। প্রকৃতির আনন্দ হইতে নিজেকে এরূপে বঞ্চিত করা যে কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা তাহা বুঝিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি। যদি বুঝিতাম আমাদের জীবন অনেকখানি সরস হইয়া উঠিত।

শহিদ

লোকমান্য তিলক

"তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ"।

—রবীন্দ্রনাথ।

মৌন বিজন-বনে প্রভাত তখনও জাগে নাই; নিশীথিনীর গাঢ় অন্ধকারে সারাদেশ তখনও আচ্ছন্ন হইয়া ছিল; সেই অন্ধকার—ভয়ের অন্ধকার; পরাধীনতার বেদনা তখন জাতির মনে জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু সে বেদনাকে ভাষা দিবার সাহস তখনও আমরা সঞ্চয় করিতে পারি নাই; স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে তখন আমরা আরম্ভ করিয়াছি বটে কিন্তু সেই স্বপ্নকে মনের কোণেই তখন আমরা লুকাইয়া রাখিতাম—কি জানি, মনের কথা বাহিরে প্রকাশ করিলে হয়ত কি সর্ব্বনাশই না ঘটিয়া যায়। কিন্তু এই যে মুক্তির স্বপন সেও মুষ্টিমেয় লোকের মনেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের অধিকাংশ নরনারী ভাবিতেই

পারিতনা যে আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মানী বা ইংলণ্ডের মত তাহাদের দেশেরও স্বাধীন হইবার অধিকার আছে।

দেশের তখন এইরূপ অবস্থা; মানুষ তখন যাহা চিন্তা করিত তাহা মন খুলিয়া বলিতে পারিত না; কিন্তু এই ভীরুতার অপেক্ষাও গভীরতর নৈরাশ্যের কারণ ছিল আমাদের চিন্তার আড়ষ্টতা, ভাবের দৈন্য, মনের শিকল। স্বাধীনতা যে কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আলো বাতাসের মত উহার উপরে যে দুনিয়ার ছোট বড় সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে এবং সে অধিকার যে কাহারও দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না—মাতৃদুগ্ধেরই মত উহাতে যে সকলেরই জন্মগত অধিকার—এইভাবে চিন্তা করিবার মত তখন দেশের মানসিক স্বাধীনতা ছিল না।

দেশের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় তখন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এক তেজস্বী মারাঠা-ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল। সেই ব্রাহ্মণবীরের প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার চিহ্ন, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আগুনের শিখা যেন লক্ লক্ করিতেছে। এই তেজস্বী মারাঠা ব্রাহ্মণ—বালগঙ্গাধর তিলক।

বিশ্বকর্ম্মা বিদ্রোহীর উপাদানে এই মহাপুরুষকে নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকায় জন্মিলে জর্জ্জ ওয়াশিংটন অথবা এব্রাহাম লিংকন হইতেন—চীনে জন্মিলে সান-ইয়াৎ-সেনের ন্যায় বিদ্রোহের ধ্বজা লইয়া বাহির হইতেন—তুরস্কে জন্মিলে কামালের আসন লাভ করিতেন—আয়ারলাণ্ডে জন্মিলে ডি ভ্যালেরার মত যুদ্ধ করিতেন—মরক্কোয় জন্মিলে রীফ সেনাপতি আবদুল করিমের স্থান লইতেন—রুশিয়ায় জন্মিলে লেনিনের অর্ঘ্য লাভ করিতেন। এক কথায় তিনি বিদ্রোহী ছিলেন—যোদ্ধা ছিলেন—বিশেষ করিয়া ভাঙিবার জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

তিনি ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন ভয়—পুলিশের ভয়, কারাগারের ভয়, রাজার ভয়; তিনি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন স্বপ্ন—স্বাধীনতার স্বপ্ন, শিকল-ভাঙ্গার স্বপ্ন।

কিন্তু সৃষ্টি করিবার শক্তি কি তাঁহার ছিল না? কে বলিল? মস্তিষ্কের অদ্ভুত ক্ষমতা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইতে পারিতেন—ইতিহাস ও গণিতে তাঁহার অদ্ভুত অধিকার ছিল। কিন্তু ম্যাজিনী যেমন ইটালির স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশোলাভের প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিলকও তেমনি স্বদেশকে পরাধীনতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়িয়া সংগ্রামক্ষেত্রকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। একবার তাঁহার এক বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া একজন পার্শী ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তিলক, আপনি ইতিহাস-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিলেন কেন? ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ত' আপনি খুব যশস্বী হইতে পারিতেন। তিলক হাসিয়া বলিলেন—"ভারতবর্ষ ত' আর বন্ধ্যা নারীর মত নহে। দেশ স্বাধীন হইলে আমার মত সহস্র সহস্র তিলক জন্মগ্রহণ করিবে।" আর একবার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—স্বরাজ লাভের পর আপনি কি হইবেন? প্রধান মন্ত্রী না পররাষ্ট্র-সচিব? তিলক হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে আমি কলেজে ফিরিয়া গিয়া গণিতের অধ্যাপনা করিব। এই নির্লোভ ব্রাহ্মণের আর কোন স্বপ্ন, আর কোন চিন্তা, আর কোন আকাঙ্ক্ষা, আর কোন ব্রত ছিল না। তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল—স্বদেশকে স্বাধীন করা। ইহাই ছিল তাঁহার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন। যিনি ইচ্ছা করিলে আপনার সুগভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা

বিশ্ব জয় করিয়া অগণিত মুগ্ধ নরনারীর প্রশংসামাল্য লাভ করিতে পারিতেন—তিনি স্বেচ্ছায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদেশীর নির্ম্মিত কারাগারে কয়েদীর শৃঙ্খল বহন করিলেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিময় কক্ষে, জনতার কোলাহল হইতে বহু দূরে বিদ্যার উপাসনা করা যাঁহার জীবনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের শরশয্যা অকুতোভয়ে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার কঠোর নির্ম্মল জীবন বেদনার দুঃসহ আগুনের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া তিনি এই দুর্ভাগা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? সে কোন্ নিষ্ঠুরা জননী—যিনি তাঁহাকে বাহিরের সমস্ত আরাম হইতে বঞ্চিত করিয়া দুঃখের দুর্গম পথে আজীবন ছুটাইয়াছিলেন? যাঁহার দুর্জ্জয় আহ্বান তাঁহার জীবনসন্ধ্যার স্নিগ্ধ-বিশ্রামটুকুও কাড়িয়া লইয়া ক্লান্তি-হীন কর্ম্মের পথে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিল? জীবনে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই—মরণ তাঁহাকে বিশ্রাম দিয়াছে—এই বিশ্রাম বীরের বিশ্রাম, এই শান্তি কুরুক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অভিমন্যুর গৌরবের শান্তি। জননীর মুক্তির জন্য বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া যিনি আসিয়াছিলেন, মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়াও তিনি সে পতাকা পরিত্যাগ করেন নাই। আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-দিবসে নত-মস্তকে সেই অগ্নিশিখার মত ভাস্বর, দ্রোণাচার্য্যের মত তেজস্বী রণগুরুকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করি।

আনন্দমোহন

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা-আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

আজ আনন্দমোহনের স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী আপনার অতীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। আপনার অতীত ইতিহাসের প্রতি যে জাতির শ্রদ্ধা নাই—সে জাতির ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। ভারতের সর্ব্বত্র এই যে নবজীবনের শঙ্খধ্বনি আমরা আজ শুনিতে পাইতেছি এই জীবন আলাদীনের প্রদীপের কৃপায় এক রাত্রেই স্ফুরিত হইয়া উঠে নাই। পূর্ব্বদিগন্তে স্বাধীনতার অরুণোদয় দেখিবার জন্য কত মহাপুরুষকেই না প্রহরের পর প্রহর জাগিয়া রজনীর অন্ধকারে তপস্যা করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন-প্রভাতের এই চাঞ্চল্যের মাঝখানে আমরা যদি রাত্রির সেই তপস্যাকে অস্বীকার করি অথবা ভুলিয়া যাই তবে কৃতঘ্নতার কালিমায় আমাদের ললাট চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিবে।

গত-যুগের নীরব তপস্বীদলের মধ্যে আনন্দমোহনকে আমরা

কিছুতেই ভুলিতে পারি না। তিনি ত' কেবল ক্ষণিকের উন্মাদনায় মাতিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মত দেখা দেন নাই; দেশসেবা তাঁহার পক্ষে অবসর সময়ের ভালবাসামাত্র ছিল না; দেশমাতৃকার পাদপদ্মে তিনি আপনার তনু-মন-ধন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর পৃষ্ঠে লর্ড কার্জ্জনের কষাঘাত তাঁহার অন্তরে যে দাগা দিয়াছিল তাহার অসহ্য জ্বালায় তিনি ব্যাধির জ্বালা ভুলিয়া স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন বাঙ্গলার প্রাণের ঐক্যকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য যখন 'ফেডারেশন হল' প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয় তখন উহার ভিত্তি স্থাপনের ভার পড়ে আনন্দমোহনের উপর। কিন্তু আনন্দমোহন তখন দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া সভাস্থলে আনা হইল। রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া অসহ্য যাতনার মধ্যে তিনি সেদিনের জন্য যে বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভাবের উচ্চতায় এবং ভাষার তেজস্বিতায় অতুলনীয় হইয়া আছে। মানুষের আত্মার গরিমা দেহের যাতনাকে অতিক্রম করিয়া কত উপরে উঠিতে পারে—রুগ্ন আনন্দমোহনের মুখে আশার দীপ্তি দেখিয়া সে দিন বাঙ্গালী তাহা বুঝিয়াছিল।

আনন্দমোহনের কণ্ঠ আজ চির-নীরব। কিন্তু বাঙ্গলার তরুণ সমাজ একথা আজ কেমন করিয়া ভুলিবে যে একদা সুরেন্দ্রনাথের সহযোগে 'ষ্টুডেণ্ট্স্ এ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা করিয়া আনন্দমোহনই ছাত্রগণকে মাতৃমন্ত্রে প্রথম দীক্ষিত করিয়াছিলেন? একথা আমরা আজ কেমন করিয়া ভুলিব যে, একদিন ভারতের দেশাত্মবোধ যখন জড়তা ও ভীরুতার জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল তখন "ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে"র সম্পাদক আনন্দমোহন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই ঘুমের রাজ্যে প্রথম বৈতালিকের জাগরণীগান গাহিয়াছিলেন?

আনন্দমোহন অধ্যাপক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ, বি এ, এবং এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন,—তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম 'র‍্যাংলার' হইবার যে গৌরব সেও আনন্দমোহনের; তাঁহার বাগ্মিতাও বড় কম ছিল না; ওকালতিতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রসার ছিল। কিন্তু আনন্দমোহন যেখানে বাঙ্গালীর স্মৃতি-মন্দিরে অমর হইয়া আছেন সেখানে তিনি পণ্ডিত নহেন—ব্যবহারজীবি নহেন—বাগ্মী নহেন। যেখানে তিনি শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার হৃদয়ের জ্বালাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন—যেখানে বাঙ্গলার কোটী কোটী নর নারীর বেদনায় তাঁহার চক্ষে অশ্রু ঝরিয়াছিল—যেখানে বৈদেশিক শাসনের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য দেখিয়া তাঁহার ভিতরের যোদ্ধা-পুরুষটী ক্রোধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যে আনন্দমোহনের কোন কালেই মৃত্যু নাই।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ

অতীতের গর্ভ হইতে আজ মুগ্ধ-নয়ন-সম্মুখে জাগিয়া উঠে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণের মূর্তি যাঁহার কম্বুকণ্ঠে ম্যাজিনির আদর্শের কথা শুনিয়া তরুণ বাঙ্গলা একদিন মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। আজ 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি শুনিলে দেশের পঞ্চম বর্ষের শিশুর দেহেও রক্ত-লহরী নাচিয়া উঠে—কিন্তু দেশের হৃদয়ে দেশমাতৃকার প্রতিষ্ঠা হঠাৎ একদিনে হয় নাই। এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সহিত আর এক প্রদেশের হৃদয়ের কোনও যোগ ছিল না, যেদিন সকলেই আপন আপন গৃহকোণে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া মগ্ন থাকিত, পরাধীনতার দুঃখ-গ্লানি নির্জ্জনে ও নীরবে সহ্য করিত, যেদিন একই স্বপ্নে, একই আশার তরঙ্গে নিখিল ভারতের হৃদয় আজিকার মত উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই। সেদিনের সেই জাতীয় জীবনের অন্ধকারে যিনি বোধন শঙ্খ বাজাইয়া সর্ব্বপ্রথম দেশমাতৃকার পূজা-বেদী রচনা করেন—তিনি সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দেশে কোনও প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন নাই। তখন তাঁহার তরুণ শোণিতে

বার্ক ও ম্যাজিনির সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছিল; চক্ষের সম্মুখে স্বাধীন ইটালীর চিত্র ভাসিতেছিল; স্বদেশের নিশ্চেষ্টতা, ভীরুতা এবং ভাবুকতার অভাব দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। সমস্ত ভারতবর্ষকে একই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই শুভক্ষণে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হইল। এই নব প্রতিষ্ঠানের জনক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পরমসুহৃদ কর্ম্মজীবনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহনের স্মৃতিও এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের সহিত জড়িত হইয়া আছে। এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে একটা সুদৃঢ় জনমতের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে একই সূত্রে আবদ্ধ করা। দেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের চিহ্নমাত্র ছিল না তখন এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ ঢাকা হইতে মূলতান পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র ভারতবাসীব রাজনৈতিক অধিকারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। আজ আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিতেছি—তখন অবশ্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা এত উচ্চ ছিল না; কিন্তু সেদিনের সেই অস্পষ্ট ঊষালোকে দেশের একপ্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত যিনি সর্ব্বপ্রথম দেশাত্মবোধের তরঙ্গ :তুলিয়াছিলেন—তিনি যে :এই বাঙ্গলার সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উত্তরকালে দেশ তিন তিন বার তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া আপনার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছে।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ গৌরবের উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। বঙ্গভঙ্গের দারুণ দুর্দ্দিনে জাতীয় বেদনার প্রতিমূর্ত্তিরূপে তিনি উদিত হইয়াছিলেন; তাঁহার ওজস্বিনী বাণী শুনিয়া সেদিন বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল; "মুকুটহীন রাজা" বলিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিল। কার্জ্জনের তীব্র

কষাঘাতে জাগ্রত সেই পুরুষসিংহের বজ্রবাণী বাঙ্গালী কোন দিনই ভুলিবে না।

পরবর্ত্তী যুগে স্বাধীনতার আদর্শ ও পন্থা লইয়া তাঁহার সঙ্গে অরবিন্দ, তিলক প্রমুখ নেতৃগণের তীব্র মতবিরোধ হয়; তিনি ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়ান; সে কথা আজ বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাক্—শুধু দেশের চিত্তাকাশে এই কথা আজ জাগিয়া উঠুক যে একদিন দেশব্যাপী জড়তার ও ভীরুতার অন্ধকারে যিনি মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া মাতৃ-পূজার উদ্বোধন করিয়াছিলেন তিনি—সুরেন্দ্রনাথ। আজ সেই সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে আমরা অশ্রুজলসিক্ত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি—যিনি একাধারে বাগ্মী ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন, লেখক ছিলেন, যিনি বঙ্গের শ্যামল বক্ষে ম্যাজিনির নব্যইটালীর স্বপ্ন জাগাইয়াছিলেন, কার্জ্জনের দম্ভ যিনি চূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি একই সঙ্গে ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য ও ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ লইয়া দেখা দিয়াছিলেন।

সূর্য্য ডুবিল

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

—রবীন্দ্রনাথ।

লাজপত নাই। পাঞ্জাব-কেশরীর গর্জ্জন চিরদিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে। সহসা এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; তিনি যে আমাদের জাতীয়-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছেন; আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের যখন সবেমাত্র প্রভাত তখনই তিনি রণগুরুর বেশে আসিয়া তূর্য্যনিনাদে আমাদের জড়তা ভাঙ্গিয়াছিলেন; তাহার পর কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা আমাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, দুর্গমশৈলপথে কত ওঠা-নামার মধ্য দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি; পথে কত বিভীষিকা আসিয়াছে; সেই বিভীষিকা দেখিয়া প্রভাতের কত বন্ধু মধ্যপথে আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু লাজপতকে আমরা

তাঁহার স্মৃতি-দিবসে অশ্রুপাত করিয়া আমরা বীরের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করিব না। তিনি বাঁচিয়াছেন বীরের মত, মরিয়াছেন বীরের মত। ভীরুতা তাঁহার জীবনের শুভ্র পাতায় কলঙ্কের একটী রেখাপাতও করে নাই। তাজমহলের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য লইয়া বিপুল মহিমায় তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

মরিবে একদিন সকলেই—কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মরিয়া যায় পিছনে মরুভূমির শূন্যতা রাখিয়া; শুধু পুরুষ-সিংহগণ যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন পিছনে তাঁহাদের থাকিয়া যায় সাধকের তপস্যার সম্পদ যাহা সমস্ত জাতিকে গৌরবান্বিত করে। লাজপত আমাদিগকে সেই গৌরবের অধিকারী করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি জাতিকে সম্পত্তি দান করিয়াছেন; সে দান বড় দান—তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার আরও বড় দান—তাঁহার সত্যনিষ্ঠার আদর্শ। এই সত্যের অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি রাষ্ট্রের অভিশাপ শিরে ডাকিয়া আনিয়াছেন —অতি প্রিয়জনের বিরাগভাজন হইয়াছেন তথাপি আপনার সিংহাসন কাহাকেও ছাড়িয়া দেন নাই।

তাঁহার জন্মকালে বহু দেবদেবী নবজাত শিশুর জন্য উপহার লইয়া সূতিকাগারে আসিয়াছিলেন—সরস্বতী তাঁহাকে পাণ্ডিত্য দিয়াছিলেন, কমলা তাঁহাকে অর্থ দিয়াছিলেন, ভবানী তাঁহাকে খড়্গ দিয়াছিলেন। লালাজীর সম্পদ ছিল, বিদ্যা ছিল—কিন্তু যাহা তাঁহাকে সকলের বরেণ্য করিয়াছে সে তাঁহার খড়্গ। তিনি শান্তি চাহেন নাই, আরাম চাহেন নাই—তিনি চাহিয়াছিলেন সংগ্রাম—মিথ্যার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। মিথ্যার সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া তিনি একটি দিনও চলিতে পারিলেন না; নির্জ্জীব শান্তিবাদীদের দলে নাম লিখাইয়া মেষের মত করুণ-সুরে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া তাঁহার স্বভাবের একান্ত বিরোধী ছিল। তিনি

ছিলেন নির্ম্মম যোদ্ধা, কণ্ঠে তাঁহার ছিল সিংহের গর্জ্জন ; তিনি গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়া, রণতূর্য্য বাজাইয়া দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য পার্থের মত আসিয়াছিলেন। নীরবতাকে তিনি ভীরুতা বলিয়া ঘৃণা করিতেন, নিশ্চেষ্টতাকে তিনি ক্লৈব্য বলিয়া উপহাস করিতেন। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর, গীতার অর্জ্জুন ছিল তাঁহার আদর্শ। কিন্তু সেই কর্ম্মের পিছনে আসক্তি ছিল না, যশের আকাঙ্খা ছিল না ; ফুল যেমন করিয়া আপনার গন্ধ বিতরণ করে তেমনি করিয়া আপনাকে তিনি সর্ব্বত্র বিলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু নাই ; ভারতের আকাশে চন্দ্রসূর্য্য যতদিন কিরণ দিবে লালাজীও ততদিন অম্লান গৌরবে বাঁচিয়া থাকিবেন।

দলবাহাদুর

"চায়না সেজন পিছন পানে ফিরে,
বায়না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগ্‌ল তোমার হাওয়া।"

রবীন্দ্রনাথ

[দলবাহাদুর গিরি দার্জ্জিলিং সহরে ১৮৮৬ সনের ৮ই মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শিবলাল গিরি দার্জ্জিলিংএর পুলিশ সবইনস্পেক্টর ছিলেন। দলবাহাদুর সিকিম রাজসরকারে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন—তাঁহার ধন-জন-সম্মান কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মহারাজা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। মহারাজের মৃত্যুর পর গিরিজীর সহিত ইংরাজ রেসিডেন্ট এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবর্গের বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উঠে। গিরিজী চিরদিনই স্বাধীনচেতা এবং জনপ্রিয় ছিলেন। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত রাজকর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তিনি সিকিম রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। সিকিম ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করায় তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে সীমান্তের জঙ্গলে রাখিয়া আসা হইল। পত্নী কৃষ্ণমায়া তখন অন্তঃসত্বা। কপর্দ্দকশূন্য গিরিজী দুইটি শিশুসন্তান ও পত্নীকে লইয়া তিস্তার পরপারে কালিম্পংয়ে

চলিয়া আসিলেন। সিকিমে তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইল। অহিংস অসহযোগের তূর্য্যনিনাদে এই সময় ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। দল বাহাদুরের স্বাধীন চিত্ত এই তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন—মহাত্মার পতাকা হাতে লইয়া তিনি হিমালয়ের বুকে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেখিল—স্বাধীনতার অগ্নিবাণী যদি গিরিজীর কণ্ঠ দিয়া তেজস্বী গুর্খা জাতির ভিতরে এইরূপে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আইনের অমোঘ অস্ত্রে শাসকগণ তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিল। একবার নয়, দুইবার নয়—তিন তিনবার এই বীরপুরুষ স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে কারাবরণ করেন। দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি এই আন্দোলন ছাড়িয়া দাও, নিরাপদে থাকিবে। গিরিজী দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—একবার সত্য বুঝিয়া যাহা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি, নির্য্যাতনের ভয়ে ভীরুর মত তাহাকে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?" অশিক্ষিত গুর্খাজাতির ভিতর হইতে এইরূপ নির্ভীক উক্তি শুনিতে পাইবে—গবর্ণমেণ্ট তাহা আশা করে নাই। সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইল। ব্যুরোক্রেশী কাপুরুষের মত তাহার প্রতি ১০৯ ধারা প্রয়োগ করিল। হুগলি জেলে লেখকের সহিত গিরিজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বার বার জেল খাটিয়া গিরিজীর দেহ ভাঙিয়া গিয়াছিল। কারামুক্তির পর তিনি কালিম্পং চলিয়া যান। যক্ষ্মারোগে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কালিম্পং-এর একটী সন্ধ্যার স্মৃতি এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ইহা আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। গিরিজীর স্ত্রী-পুত্রগণ এক্ষণে সবরমতীতে মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহাশ্রমে বাস করিতেছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হিমালয়ের বুকে ঘনাইয়া আসিতেছিল; আমি গিরিজীর রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম; এমন সময় তিনি ক্ষীণকণ্ঠে আপনার পুত্রকন্যাগুলিকে কাছে ডাকিলেন; তাহারা একে একে আসিয়া বসিলে গিরিজী তাহাদিগকে গান শুনাইতে বলিলেন; সুললিত বাল-কণ্ঠে গীত আরম্ভ হইল। চারিদিক নিস্তব্ধ; দৈন্য-ভরা কুটীরে

রোগশীর্ণ গিরিজী মুদিত-নেত্রে গান শুনিতেছিলেন; গানের একটী চরণ—"হে শান্তিদাতা পরমেশ্বর, তোমারই জয় হউক"। আমার ভিতরে তখন কি ভাব হইতেছিল বলিতে পারি না। আমলাতন্ত্রের অমানুষিক নির্য্যাতনে তাঁহার দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; দারিদ্র্য-রাক্ষসী অদূরে দাঁড়াইয়া আপনার অসহায় পত্নী ও পুত্রকন্যাগুলির প্রতি দারুণ কটাক্ষপাত করিতেছে; যে দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দুঃখ, এই নির্য্যাতন ভোগ—তাহা আজ ঘোর আত্মকলহে নিমগ্ন; পরাধীন দেশের ভীরুতার অপবাদ ঘুচাইবার জন্যই হাসিমুখে তিনি জেলে গিয়াছিলেন; দীর্ঘ কারাবাসের অবসানে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বীর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এ কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য হাসিমুখে একটী প্রাণীও আগাইয়া আসিল না; কোথাও মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল না; কোনও গৃহে উৎসবের একটী প্রদীপও জ্বলিল না! অন্ধকার-গর্ভে সরিসৃপের মত সবাই যে আপন আপন রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত; শাসনশক্তির ভয়ে সমস্ত দেশটা জলসিক্ত কুক্কুরের মত কাঁপিতেছে; তাঁহার জন্য কোনও দ্বার উন্মুক্ত নাই; দার্জ্জিলিংএর কোথাও মাথা গুঁজিবার মত বিদ্রোহীর স্থান মিলিল না; অবশেষে একটি দয়ার্দ্র পরিবার ভয় পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বের সমাদর করিল—আশ্রয়শূন্য গিরিজীর আশ্রয় মিলিল।

ভিতরে মরণের কালোছায়া, দারিদ্র্যের যাতনা; বাহিরে ভীরুতার আবর্জ্জনা, স্বার্থের পাশবিক লীলা; ইহারই মধ্যে শিশু ও কিশোর কণ্ঠে ভগবানের মহিমা গান। বিশ্ব-কবির একটি কবিতার কয়েকটী চরণ চোখের সামনে জীবন্ত দেখিলাম—

নিন্দা তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—

এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

সত্যই ত; গিরিজীর এই যে যাতনা এ তো রুদ্রেরই প্রসাদ, এতো কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ। যুগে যুগে দেশে দেশে রুদ্রের ডমরুধ্বনি শুনিয়া যাহারা স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করিবার জন্য বাহির হইল, সেই সব গৃহ-ছাড়া পথিকের ভালে ভগবান অলক্ষণের তিলকরেখা আঁকিয়া দিলেন। উন্মত্ত দুর্দ্দিনকে শিরে বহিয়া, চিত্তে অন্তহীন আশা লইয়া 'আনন্দিত সর্ব্বনাশে'র পথে তাহাদের যাত্রা সুরু হইয়াছে; মরণ হাতছানি দিয়া ডাকিয়া তাহাদিগকে পথে বাহির করিয়াছে। অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে; শূল তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে; কুঠার তাহাদিগকে ছিন্ন করিয়াছে; কিন্তু তবুও তাহাদের যাত্রা আজও থামে নাই; প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত সেই সব পথিকের দল আজও মরিতে ছুটিয়াছে। গিরিজীর শয্যাপার্শ্বে আমার সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা যেন সরিয়া গেল, স্থানের ব্যবধান যেন লোপ পাইল।

প্যালেসটাইনের বুকে দেখিলাম রক্তমাখা ক্রুশকাষ্ঠে দোদুল্যমান এক যুবকের মূর্ত্তি; তাঁহার মাথায় কাঁটার মুকুট; ক্ষতস্থানগুলি হইতে টপ টপ করিয়া তাজারক্ত ঝরিতেছে; সম্মুখে তাঁহার জননী দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন; যুবকের মুখে বেদনার কালোছায়া; ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে অসীম প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাঁহাকে ঘেরিয়া এক জ্যোতির সমুদ্র নাচিতেছে। সেই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গাঘাতে প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী রোমসাম্রাজ্য দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল, পশুবল সভয়ে মুখ লুকাইল। সেই বিদ্রোহী ইহুদী যুবককে চিনিলাম,—তিনি খৃষ্ট।

আরবের মরুভূমিতে সেই বিদ্রোহের প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে আবার

দেখিলাম; রাজ-পুতানায় আরাবল্লীর পার্ব্বত্য-প্রদেশে দেখিলাম সেই বিদ্রোহের আর একটী স্ফুলিঙ্গ। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া হৃত-সর্ব্বস্ব রাণা প্রতাপ সপরিবারে পর্ব্বতক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন; শয়ন গিরিগুহায়, আহার ঘাসের রুটী; একটি বন্য বিড়াল আসিয়া মহারাণার শিশু-কন্যার হাত হইতে রুটী কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; ঘরে খাবার নাই; ক্ষুধিত শিশু উদরের জ্বালায় কাঁদিতেছে; প্রতাপ এক হাতে অশ্রু মুছিলেন, অন্য হস্তে তরবারী আরও দৃঢ়-মুষ্ঠিতে চাপিয়া ধরিলেন। স্বাধীনতার অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত এমনি সব পথিক একে একে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

সর্ব্বশেষে দেখিলাম আফ্রিকার জোহান্সবার্গ সহরে ব্যারিষ্টারের পোষাক-পরিহিত এক ভারতীয়ের মূর্ত্তি; সেই মূর্ত্তিকে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট ও সবল বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু তাঁহার আয়ত-নয়নে দেখিলাম অসীম করুণা, মুখে দেখিলাম কঠোর দৃঢ়তার ছবি। আর দেখিলাম সেখানকার ভারতীয়গণের অধিকার শ্বেতকায়গণের হস্তে বিপন্ন। হঠাৎ কোথায় রুদ্রের তূর্য্যধ্বনি বাজিয়া উঠিল; দেখিলাম, ভারতবাসিগণ আপনাদের আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দলে দলে বীরের বেশে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের সকলের পুরোভাগে দেখিলাম সেই জোহান্সবার্গের আইন ব্যবসায়ীর মূর্ত্তি। নিমেষের মধ্যে দেখিলাম সেই ব্যারিষ্টারের পোষাক অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার স্থানে কয়েদীর ছোট পোষাক পরিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আফ্রিকার রৌদ্রে সেই মূর্ত্তি মাটী কোপাইতেছেন। নিকটে দীর্ঘকায় আবলুষ কাঠের মত কৃষ্ণবর্ণ এক কাফ্রী সর্দ্দার তাঁহাকে পাহারা দিতেছে; দেখিলাম, বন্দীর হাতে ফোস্কা গলিয়া তাহা হইতে জল ঝরিতেছে।

হঠাৎ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল; চোখের সামনে মাদ্রাজের সমুদ্র-সৈকত

জাগিয়া উঠিল ; সেখানে লোকে লোকারণ্য ; তাহার মধ্যে দেখিলাম কৌপীন-পরিহিত ক্ষীণকায় এক তাপসমূর্ত্তি! উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলাম তিনি জোহান্সবার্গের সেই ব্যারিষ্টার ; তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে সেই জন-সমুদ্রকে কহিতেছেন, আজ হইতে এই কৌপীন মাত্র সম্বল করিলাম ; ভারতে স্বাধীনতা এখনও আসিল না ; সাধারণ লোকে দারিদ্র্যবশতঃ খদ্দরও পরিধান করিতে পারিতেছে না ; সুতরাং জনসাধারণকে দরিদ্রের পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এবং শোকের চিহ্নস্বরূপ আজ হইতে আমি এইরূপ স্বল্পবস্ত্রেই সন্তুষ্ট রহিব, ভারতে আমার অপেক্ষা যেন কেহ দরিদ্র না থাকে। মনে হইল, এই মূর্ত্তিই কি পূর্ব্বে একবার গঙ্গার তীরে কাটোয়ার ঘাটে চাঁচরকেশ মুড়াইয়া কৌপীন পরিয়া কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল? এই মূর্ত্তিই কি বহুকাল পূর্ব্বে কপিলাবস্তুর রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া কাঠুরিয়ার ছিন্নবসন পরিয়া মানবের মুক্তি-সন্ধানে ছুটিয়াছিল? আবার দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল ; এবারে দেখিলাম—প্রকাণ্ড এক আদালত গৃহ লোকে লোকাকীর্ণ ; জনৈক ইংরাজ বিচারক গম্ভীরভাবে কাগজপত্র দেখিতেছেন ; তাঁহার সম্মুখে কৌপীন-পরা ক্ষীণকায় এক তাপসমূর্ত্তি যাহাকে পূর্ব্বে আফ্রিকার কারাগারে বন্দীবেশে দেখিয়াছিলাম। বন্দী জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"আমি যে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী, ইহা আমি শতবার স্বীকার করিতেছি ; রাজদ্রোহ প্রচার করা আমার বর্ত্তমান ধর্ম্ম ; আমাকে ছাড়িয়া দিলেও এই প্রচারকার্য্য হইতে ক্ষান্ত থাকিব না। ইহার জন্য আইনের কঠোরতম শাস্তি লইতে আমি প্রস্তুত।" তাঁহাকে চিনিলাম—তিনি মহাত্মা গান্ধি, ভারতের মুক্তিসমরের সেনাপতি।

আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ; পাশে দেখিলাম—গিরিজী চোখ বুজিয়া

ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে স্বাধীনতার সঙ্গীত শুনিতেছেন। রোগশীর্ণ বদনে কি এক প্রশান্ত নির্ভীকতা! দলবাহাদুরকে চিনিলাম। যুগে যুগে যে সব বীরের দল নির্য্যাতনের এবং দুঃখের নির্ম্মম-চাপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন তথাপি নত হয়েন নাই—যাঁহারা শির দিয়াছেন অথচ শের দেন নাই এই অহিংস অসহযোগের পতাকাধারী গুর্খাবীর সেই সব অগ্নি-পথিক-দলেরই একজন।

গান থামিয়া গেল—গিরিজী করুণকণ্ঠে বলিলেন, I had to stop in the half way. আমাকে অর্দ্ধপথে থামিতে হইল। তিনি রোগশয্যায় বসিয়া নিজে ছেলেমেয়েদের গান শিখাইয়াছেন, কিন্তু কণ্ঠ আজ তাঁহার রোগের তাড়নায় রুদ্ধ; দেহ অবসন্ন। কে আর এমন করিয়া তাঁহার পুত্র-কন্যাগুলিকে শিখাইবে?

নৈরাশ্যে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,—কিন্তু হৃদয়ের মধ্য হইতে কে যেন গম্ভীরস্বরে গীতার মহাবাণী বলিয়া উঠিল—'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' কল্যাণকামী কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

দেশবন্ধু

"সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।"

রবীন্দ্রনাথ

নাগপুর কংগ্রেসে রাজার বেশে যিনি যুদ্ধজয় করিতে গিয়াছিলেন—তিনি ফিরিয়া আসিলেন ফকির হইয়া। বরিশাল কনফারেন্সে তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন—দুটীচক্ষু ভরিয়া তাঁহাকে দেখিলাম। ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল সেই মূর্ত্তি! তিনি বক্তৃতা দিলেন; স্বর কাঁপিতে লাগিল যেমন করিয়া অঙ্গুলির আঘাতে বীণার তার কাঁপে। ভোগের মধ্যে অতি নিবিড় ভাবে তিনি জড়িত হইয়া ছিলেন। তাঁহার ছিল রাজার ঐশ্বর্য্য। সহসা কোন অজানা-জগৎ হইতে বাঁশির সুর আসিয়া পৌঁছিল তাঁহার মনে। তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন। আকাশপথ দিয়া বনের হাঁস যখন গান করিতে করিতে উড়িয়া যায় উঠানের হাঁস তখন সেই গান শুনিয়া চকিত হইয়া উঠে। পোষা-হরিণ যখন দূরের বাঁশী শোনে তখন চঞ্চলনেত্রে সে অরণ্যের দিকে তাকায়।

বন তাহাকে ডাক দেয়। কোন্ সে অচেনা-মানুষ জীবনের অপরাহ্নে তাঁহাকে এমন করিয়া ডাক দিয়াছিল? কোনখানে লুকাইয়া থাকিয়া তিনি প্রেরণ করেন তাঁহার দুর্জ্জয় আহ্বান যে আহ্বান শুনিয়া রাজা নিমেষের মধ্যে ফকির হইয়া যায়,—চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোকে পরিণত হয়, দস্যু রত্নাকর কবি বাল্মীকি হইয়া দেখা দেয়,—মানুষের জীবন-ধারা চিরঅভ্যস্তপথ ছাড়িয়া সহসা নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করে? সেই অজানা-জনের ডাকেই কি সাগরের জল পাগল হইয়া নাচে—আকাশে আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য-তারা উদ্দাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়? কেমন করিয়া মানুষের ভিতরে সহসা এই পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার ইতিহাস সত্যই রহস্য-পূর্ণ। কত মানুষ আছেন যাঁহাদের সহিত সংসারের ধূলি কাদার কোনও সংস্পর্শ নাই—যাঁহারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে পাপের স্পর্শ এড়াইয়া চলেন—যাঁহারা নিষ্কলঙ্ক—শুষ্ক কঠিন বালুকার মত নিষ্কলঙ্ক। ইঁহারা চলেন ধূলাকাদার কিছু উপর দিয়া সারাজীবন ঠিক একই ভাবে, একই পথে। আর একরকমের মানুষ আছেন যাঁহাদের মধ্যে আছে ঝড়ের মত একটা উদ্দাম গতি। প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত নহেন; তাঁহাদের মধ্যে কলুষ থাকে যথেষ্ট—ধূলি ও কাদার রাজ্যের সহিত তাঁহারা সুপরিচিত। কিন্তু সহসা দেখি—পঙ্ককুণ্ড হইতে তাঁহারা বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন স্বর্গের আলোর পানে ঈগল পাখীর মত দুটীপক্ষ বিস্তার করিয়া। মোহ অকস্মাৎ মুক্তিরূপে ফলিয়া উঠে, গুটিপোকা আকাশের ডাকে প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যায়। দেশবন্ধু ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ। ভোগী ছিলেন তিনি যথেষ্ট—কিন্তু উপরের জগতের ডাক যে দিন আসিল সেদিন সব বন্ধন তিনি ছুড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেকদিন অতীত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভুলিতে পারিনা সেই পুরুষসিংহের ব্যক্তিত্বের দৃপ্ত মহিমা। পরাজয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যাহা সত্য

বলিয়া মনে করিতেন তাহার পূজায় আপনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে জানিতেন। কে সন্তুষ্ট হইবে, কে অসন্তুষ্ট হইবে, সফলতা আসিবে না বিফলতা আসিবে—এসব চিন্তা তাঁহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। নাগপুর কংগ্রেসে তিনি যখন উপলব্ধি করিলেন আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য—তখন কোন কিছুই তাঁহার সংকল্প ও কার্য্যের মধ্যে অন্তরায় হইতে পারিল না। যাহাকে বলে বে-পরোয়া তিনি ছিলেন সেই বে-পরোয়া দলের রাজা। যাহারা দ্যূতক্রীড়া করে তাহারা পাশার দান ফেলিবার সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না। পাশা তাহারা ছুড়িয়া ফেলে—জয় আসিতেও পারে, নাও আসিতে পারে। সংসারে যাহারা জাতির ভাগ্য পরিচালনা করে তাহারা কখনও হিসাবী হয় না। "To do great things one must have a certain fearlessness of consequences, an indifference to responsibility, a fanatical faith or the gambler's recklessness." যাহারা দ্যূতক্রীড়া করে তাহাদেরই মত তাহারা বে-পরোয়া ও বে-হিসাবী। দেশবন্ধু ছিলেন বে-হিসাবী। অতি-সাবধানীদের তিনি পছন্দ করিতেন না। তীরে বসিয়া বসিয়া তিনি ভাবিতেন না—অকূল নীরে ঝাঁপ দিবার সাহস তাঁহার ছিল—তাই তিনি ছিলেন বাঙলার তরুণের মাথার মণি। আবার যে দিন গয়া কংগ্রেসে তিনি পরাজিত হইলেন—কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব যে দিন ব্যর্থ হইল সে দিন সেই পরাজয়ের মধ্যেও দেখিয়াছি তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা—আত্মবিশ্বাসের প্রাচুর্য্য—সন্দেহের একান্ত অভাব। তিনি জানিতেন the one fatal defect in a leader is indecision. পরাজয়কে তিনি ভ্রূক্ষেপের মধ্যে আনিলেন না—অক্লান্ত ভাবে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিলেন, যাহারা শত্রু ছিল তাহাদিগকে বন্ধু করিলেন। প্রবল স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি

তাঁহারই সেই অতুলনীয় সাহস এবং উদ্যমের ফল। যাহারা দ্বিধা করে, সন্দেহ করে, এক পা আগাইয়া দুই পা পিছাইয়া আসে তাহারা কোনদিন নায়ক হয় না। বিধাতা দেশবন্ধুকে নায়ক হইবার সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে কোন দিন আত্ম-অবিশ্বাস দেখি নাই! তাঁহার ত্যাগের কথা এখানে না বলিলেও চলে। সে ত্যাগের তুলনা হয় বুদ্ধের ত্যাগের সঙ্গে। মৃত্যুকালে নিজের গৃহখানি পর্য্যন্ত নর-নারায়ণের সেবায় তিনি দান করিয়া গেলেন। দেশবন্ধুর তুলনা দেশবন্ধু নিজে। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের কোনদিন অভাব হইবে না—কিন্তু দেশমাতৃকার বেদীমূলে উৎসর্গিত-প্রাণ সেই বে-পরোয়া হিসাব-ভোলা কর্ম্মবীর—তেমন মানুষ শতাব্দীতে একজনও জন্মগ্রহণ করে না। চিত্তরঞ্জন অনেক পাইব—দেশবন্ধুর অভাব পূরণ করিবার নহে।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত

অন্যান্য পুস্তক।

সব-হারাদের গান

"প্রত্যেকটী কবিতা নিপীড়িত মনুষ্যত্বের বেদনার তীব্র অনুভূতির মধ্য হইতে বিকশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের তরুণ-দলকে যে বীর্য্যপ্রদ, বলপ্রদ সাহিত্য সৃষ্টি করিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রত্যেকটী কবিতায় আমরা তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।"—**আনন্দবাজার**

"শত অত্যাচারে উৎপীড়িত যারা—মানুষ-দানবের ষড়যন্ত্র পৃথিবীর রূপরস আনন্দ হইতে যাহাদের বঞ্চিত করিতে চায় কবির গানে সেই সব-হারাদের বেদনা রক্তবরণ নিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।"—**স্বাধীনতা**

"ইহার তুলনা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।"—**উদ্বোধন**

বিদ্রোহীর স্বপ্ন

"বিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল জগতে—রাষ্ট্রে ও সমাজে—পুরাতনের জীর্ণ মৃতভার শশ্মান-চুল্লীতে ভস্ম করিয়া, যে নবসৃষ্টির কল্পনা ও প্রচেষ্টা তাহার দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ লইয়া সর্ব্বদেশের নবীন মনগুলিকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিতেছে, সঙ্কীর্ণ সংস্কার মুক্ত বিজয়লালের চিত্তও সেই আকর্ষণেই উন্মীলিত হইয়া উঠিয়াছে। 'বিদ্রোহীর স্বপ্ন' তাহারই দান।"—**আনন্দবাজার**

"এ নিদ্রিতের স্বপ্ন নয়—এ হ'চ্ছে জাগ্রত মনের নবসৃষ্টির স্বপ্ন।"—**নবশক্তি**

সভ্যতার ব্যাধি

মহাত্মাজীর বাণী

ওমার প্রসাদ (যন্ত্রস্থ)